সে ও নর্তকী

হুমায়ূন আহমেদ

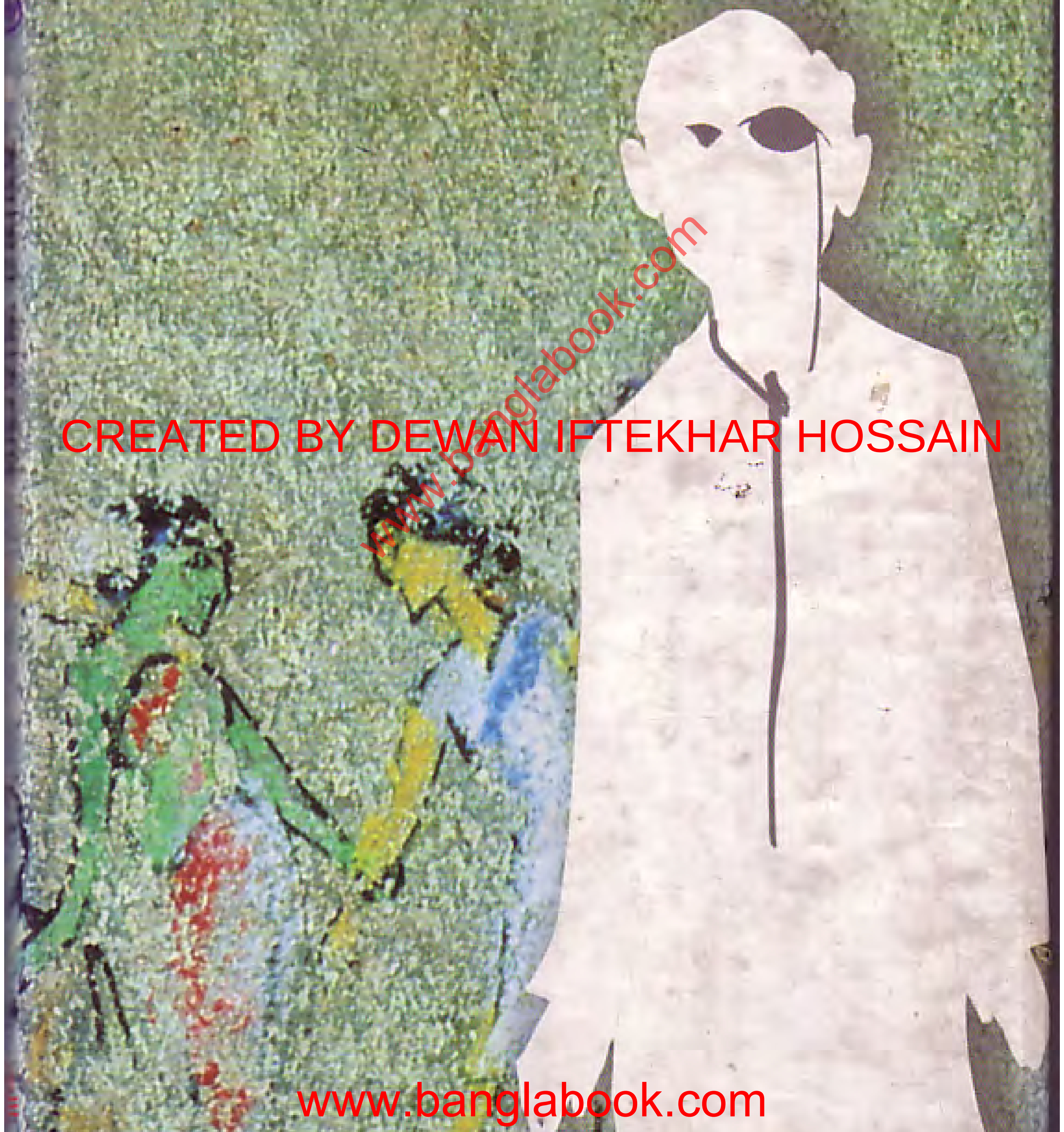

ষষ্ঠ মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
পঞ্চম মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

দিব্য প্রকাশ

©
গুলতেকিন আহমেদ

প্রকাশক
মঈনুল আহসান সাবের
দিব্যপ্রকাশ
৩৮/২ক বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৩৪৬৮৭৯

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

কম্পোজ
রে কম্পিউটার গ্রাফিক্স
৫০ পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা

মুদ্রণ
সালমানী মুদ্রণ
নয়াবাজার, ঢাকা

পরিবেশক
সৃজনশীল পাবলিশার্স লিঃ
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা

মূল্য : ৭০ টাকা

"– যত দূর যাই আমি আরো যত দূর পৃথিবীর নরম ঘাসের তলে যেন কত কুমারীর বুকের নিশ্বাস কথা কয়– তাহাদের শান্ত হাত খেলা করে– তাহাদের খোঁপার এলো ফাঁস খুলে যায়– ধূসর শাড়ির গন্ধে আসে তারা– অনেক নিবিড় পুরোনো প্রাণের কথা কয়ে যায়–"

–জীবনানন্দ দাশ

উৎসর্গ

বিমুখ প্রান্তরে সেই সবুজের সমারোহ
হাসান হাফিজুর রহমান
স্মৃতির উদ্দেশে

স্বাতীর দরজায় টুক টুক করে দু'বার টোকা পড়ল।

স্বাতী চাদরে মুখ ঢেকে ছিল, চাদরের ভেতর থেকেই বলল– কে? নাজমুল সাহেব দরজার বাইরে থেকে বললেন, শুভ জন্মদিন মা। স্বাতী বলল, থ্যাংক য়ু। সে চাদরের ভেতর থেকে বের হল না, দরজা খুলল না। নাজমুল সাহেব চলে গেলেন না। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি ফুল নিয়ে এসেছিলেন। মেয়ের একুশ বছরে পা দেয়ার জন্যে একুশটা ফুল। ফুলদানীতে ফুলগুলি সুন্দর করে সাজানো। মেয়ের পড়ার টেবিলে ফুলদানী রাখবেন, মেয়ের কপালে চুমু খাবেন– এই হল তাঁর পরিকল্পনা। কোন একটা সমস্যা হয়েছে। স্বাতী দরজা খুলছে না। নাজমুল সাহেব আবার দরজায় টোকা দিলেন। স্বাতী বলল, আমি এখন দরজা খুলব না বাবা। সারা রাত আমার ঘুম হয়নি। আমি এখন ঘুমুচ্ছি।

'ঘুমুচ্ছিস না, তুই জেগে আছিস। দরজা খুলে দে।'

'না। তুমি তোমার গিফট দরজার বাইরে রেখে যাও।'

'ইজ এনিথিং রং মা?'

'নো; নাথিং ইজ রং।'

নাজমুল সাহেব উদ্বিগ্ন বোধ করছেন। নাথিং ইজ রং বলার সময় তাঁর মেয়ের গলা কি ভারী হয়ে গেছে? গলাটা কাঁদো কাঁদো শুনিয়েছে? তিনি চিন্তিত মুখে ফুলদানী হাতে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁকে এবং তাঁর গোলাপগুলিকে লজ্জিত বলে মনে হচ্ছে।

একতলার বারান্দায় স্বাতীর মা রওশন আরা বসে আছেন। ছোট্ট নিচু টেবিলের তিন দিকে তিনটা বেতের চেয়ার। মেয়ের জন্মদিনের ভোরবেলা এক সঙ্গে চা খাওয়া হবে। তাঁর সামনে টি পট ভর্তি চা। ঠাণ্ডা যেন না হয় সে জন্যে টি-কোজি দিয়ে চায়ের পট ঢাকা। টি-কোজিটা দেখতে মোরগের মত। যেন টেবিলের উপর একটা লাল মোরগ বসে আছে। মোরগটা এত জীবন্ত মনে হয় এখনই বাগ দেবে। তার গায়ের পালক, সত্যিকার পালকে তৈরি। তার পুঁতির লাল চোখ সত্যিকার চোখের মতই জ্বলে। এই মোরগ রওশন আরার খুব পছন্দের। শুধু বিশেষ বিশেষ দিনেই তিনি মোরগটা বের করেন। আজ এটা বিশেষ দিন– তার মেয়ে একুশে পা দিয়েছে। তার জন্ম এপ্রিলের চার তারিখ ভোর ছয়টা দশে। এখন বাজছে ছয়টা কুড়ি।

নাজমুল সাহেবকে ফুলদানী হাতে ফিরে আসতে দেখে রওশন আরা অবাক হয়ে তাকালেন। নাজমুল সাহেব বিব্রত মুখে বললেন, 'ও ঘুমুচ্ছে।'

রওশন আরা বললেন, 'ঘুমুবে কেন? একটু আগেই তো শুনলাম গান বাজছে।'

'রাতে ঘুম হয়নি। এখন বোধ হয় জমেছে।'

রওশন আরার ভুরু কুঁচকে গেল। রাতে ঘুম হয়নি কথাটা ঠিক না। তিনি রাতে একবার মেয়ের ঘরে ঢুকেছিলেন। স্বাতী ভেতর থেকে তালাবন্ধ করে শোয়। তবে রওশন আরার ঘরে ঢোকায় কোন সমস্যা হয় না। তাঁর কাছে একটা লুকানো চাবি আছে। তিনি প্রায় রোজই গভীর রাতে তালা খুলে একবার দেখেন। ঘুমন্ত মেয়েকে দেখে চলে আসেন। স্বাতীর পাঁচ বছর বয়স থেকেই তিনি এই কাজটা করে আসছেন। পাঁচ বছর বয়সে মেয়ে প্রথম আলাদা ঘরে ঘুমুতে গেল। তখন দরজা খোলা থাকত। যখন তখন ঘরে ঢোকা যেত। তারপর স্বাতী ঘরে চাবি দিতে শিখল। স্বাতী চোখ বড় বড় করে বলল, 'খবর্দার মা, আর আমাকে বিরক্ত করবে না। যখন তখন আমার ঘরে আসবে না। আমার ভাল লাগে না।'

'রাতে ঘর বন্ধ করে ঘুমুতে ভয় লাগবে না তো বাবু?'

'খবর্দার, আমাকে বাবু ডাকবে না।'

'ভয় লাগবে না তো ময়না সোনা?'

'ময়না সোনাও ডাকবে না।'

'কি ডাকব তাহলে?'

'যা নাম তাই ডাকবে। স্বাতী! স্বাতী নক্ষত্র!'

রওশন আরা বললেন, 'আচ্ছা এখন থেকে শুধু নাম ধরেই ডাকব। এখন তুই বল তো মা, দরজা তালাবদ্ধ করে ঘুমুতে ভয় লাগবে না?'

'লাগবে, তবু আমি দরজা বন্ধ করে ঘুমুব।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

স্বাতী দরজা ভেতর থেকে লক করেই ঘুমোয়। তিনি দরজা খুলে ভেতরে ঢোকেন। কাল রাতেও ঢুকেছেন। মেয়ে তখন গভীর ঘুমে। গায়ে দেবার চাদরটা খাটের নীচে। ঠাণ্ডায় সে কুঁকড়ে আছে অথচ মাথার উপরের ফ্যান ফুল স্পীডে ঘুরছে। তিনি একবার ভাবলেন, ফ্যান বন্ধ করে দেবেন। সেটা করা ঠিক হবে না, মেয়ে বুঝে ফেলবে কেউ একজন রাতে তার ঘরে ঢুকেছিল। তিনি ফ্যানের স্পীডটা কমিয়ে দিলেন। ফ্যানের কাঁটা পাঁচ থেকে দুই-এ নামিয়ে আনলেন। চাদরটা খাটের নীচ থেকে তুলে পায়ের কাছে রেখে দিলেন। তাঁর খুব ইচ্ছা করছিল ঘুমন্ত মেয়ের কপালে আলতো করে চুমু দেন। তাও তিনি এই ভুল করেননি। এই বয়সের মেয়েরা ঘুমুলেও তাদের শরীর জেগে থাকে। সামান্য স্পর্শেও এরা কেঁপে ওঠে। ধড়মড় করে উঠে বসে। ভীত গলায় চেঁচিয়ে বলে- কে? কে?

রওশন আরা স্বামীর দিকে তাকিয়ে চিন্তিত মুখে বললেন, 'ওর সমস্যাটা কি?'

নাজমুল সাহেব চায়ের টেবিলের পাশে ফুলদানি রাখতে রাখতে বিব্রত ভঙ্গিতে হাসলেন। রওশন আরা বললেন, 'তোমাকে চা দিয়ে দেব?'

'না থাক। দেখি ও যদি ওঠে।'

'তোমাকে এ রকম চিন্তিত লাগছে কেন?'

নাজমুল সাহেব নিচু গলায় বললেন, 'মনে হচ্ছে স্বাতী কাঁদছে। চাদরে মুখ ঢেকে কাঁদছে।'

'সে কি?'

'তাও হতে পারে। আমার মনে হল ওর গলার স্বরটা চাপা চাপা। তুমি গিয়ে দেখবে?'

রওশন আরার যেতে ইচ্ছা করছে না। স্বামীর সঙ্গে অনেকদিন থেকে একটা ব্যাপার ঠিক করা আছে। বার্থ-ডে উইশ একেক বছর একেক জন করবে। প্রতিবারই নতুন কিছু করা হবে যেন মেয়ে চমকে ওঠে। গত বছর তিনি এই দিনে ভোর ছ'টা দশ মিনিটে বলেছেন- শুভ জন্মদিন মা। জন্মদিনের উপহার হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলেন চব্বিশ ক্যারেটের গোল্ডেন টোপাজ। হাঁসের ডিমের মত পাথর। ধবধবে সাদা চিনা মাটির প্লেটে পাথরটা সাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল এক খণ্ড সূর্য যেন সাদা প্লেটে ঝকমক করছে। স্বাতী আনন্দে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়েছে- এটা কি মা? এটা কি?

'গোল্ডেন টোপাজ।'

'পেলে কোথায় তুমি?'

'তোর মামাকে দিয়ে নেপাল থেকে আনিয়েছি। তোর জন্মদিনের উপহার। পছন্দ হয়েছে মা?'

'এত সুন্দর একটা উপহার তুমি আমাকে দেবে আমার পছন্দ হবে না? আমার তো যা মনে হচ্ছে আমি কেঁদে ফেলব।'

রওশন আরা তৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে বললেন, 'কেঁদে ফেলতে ইচ্ছা করলে কেঁদে ফেল।'

'এই পাথরটা দিয়ে আমি কি করি বল তো মা?'

'লকেট বানিয়ে গলায় পরতে ইচ্ছা করছে?'

'আমার খেয়ে ফেলতে ইচ্ছা করছে।'

মেয়ের আনন্দ দেখে রওশন আরার চোখে পানি এসে গেল। এ বছর নাজমুল সাহেব এ রকম সুন্দর কিছু জোগাড় করেননি- তবে তাঁর উপহারটাও কম সুন্দর না। একুশটা গোলাপ তিনি একুশ রকমের জোগাড় করেছেন। সাদা গোলাপ আছে, কাল গোলাপ আছে, ঈষৎ নীল গোলাপ আছে, একটা গোলাপ আছে ডালিয়ার মত বড়, আর একটা তারা ফুলের চেয়েও ছোট। নাকছবি হিসেবে নাকে পরা যায় এমন। মেয়ের চিৎকার এবং উল্লাস দেখবেন এই আশায় নাজমুল সাহেব পরিশ্রম করে গোলাপগুলি সংগ্রহ করেছেন। মেয়ে দরজা খোলেনি।

রওশন আরা স্বাতীর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে নরম গলায় বললেন, 'দরজা খোল মা।'

স্বাতী বলল, 'তোমার কাছে তো চাবি আছে তুমি খুলে ফেল।'

'তোর সঙ্গে চা খাবার জন্যে আমরা দু'জন নীচে বসে আছি।'

'এখন ঘর থেকে বেরুতে ইচ্ছা করছে না।'

'তোর কি হয়েছে?'

'দারুণ মন খারাপ লাগছে।'

'কেন?'

'জানি না কেন।'

'হাত মুখ ধুয়ে নীচে আয়। ভাল লাগবে। তোর বাবা তোর জন্যে একুশ রকমের গোলাপ জোগাড় করেছে। বেচারা একুশ রকমের গোলাপ জোগাড় করতে গিয়ে খুব কষ্ট করেছে। একদিনে তো সব জোগাড় হয় না। একেকটা করে জোগাড় করেছে, লবণ পানিতে ডুবিয়ে, পলিথিনে মুড়ে ফ্রীজে রেখে দিয়েছে।'

'আমি যদি আরো দশ বছর বাঁচি তাহলে বাবার খুব কষ্ট হবে। একত্রিশটা বিভিন্ন রকমের গোলাপ পাওয়া তো সহজ কথা না।'

'স্বাতী।'

'কি মা?'

'বেলা হয়ে যায়।'

'আসছি। পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি। তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না মা। তুমি বাবার কাছে যাও। আমি সেজেগুজে নীচে নামব।'

নাজমুল সাহেব উদ্বিগ্ন চোখে তাকালেন। রওশন আরা বললেন, 'ও আসছে।'

'ব্যাপারটা কি?'

'কোন ব্যাপার না। মন খারাপ আর কি। মানুষের মন খারাপ হয় না? উৎসব-টুৎসবের দিন মন খারাপ বেশি হয়। তোমাকে একটু চা দেব?'

'না, ও আসুক।'

'ওর মনে হয় আসতে দেরি হবে। সেজেগুজে আসছে। তোমার তো আবার ঘুম থেকে উঠেই চা খাবার অভ্যাস।'

'একদিন অভ্যাসের হের-ফের হলে কিছু হবে না। আমার কেন জানি দুশ্চিন্তা লাগছে। মেয়েটার কি হয়েছে বল তো?'

'হবে আবার কি? কিছু হয় নি। একা একা থাকে তো, এই জন্যেই, মুডি ধরনের হয়েছে। কয়েকটা ভাই-বোন থাকলে হেসে খেলে, ঝগড়া ঝাটি করে বড় হত তাহলে কোন সমস্যা হত না।'

'ওর বিয়ে দিয়ে দিলে কেমন হয়? স্বামীর সঙ্গে হৈ চৈ করবে, গল্প করবে, ঝগড়াঝাটি করবে। ভাল একটা ছেলে দেখে....।'

'কোথায় পাবে ভাল ছেলে?'

'ভাল ছেলে পাওয়া সমস্যা তো বটেই।'

'একজন কাউকে ধরে আনলেই যে তোমার মেয়ের পছন্দ হবে, কে বলল?'

নাজমুল সাহেব চিন্তিত মুখে মাথা নাড়লেন। নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওর পছন্দের কেউ আছে?'

'না। থাকলে জানতাম। ওর পছন্দের কেউ নেই।'

'থাকলেও তোমাকে হয়ত সে বলবে না।'

রওশন আরা বললেন, 'অবশ্যই বলবে। আমাকে না বলার কি আছে?'

'মায়েরা সব সময় এটা ভুল করে। মায়েরা মনে করে তার মেয়ে যেহেতু তার অংশ সেহেতু মেয়ে তার জীবনের সব কথা মাকে বলবে। ব্যাপারটা সে রকম না। তুমি কি তোমার সব গোপন কথা তোমার মা-কে বলেছ?'

'প্রয়োজনের কথা সবই বলেছি।'

'তারপরেও অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে গেছে।'

'আজে বাজে ব্যাপার নিয়ে তর্ক করতে ভাল লাগছে না। চুপ করে থাক।'

'আচ্ছা যাও চুপ করলাম। খবরের কাগজ এসেছে?'

'এত সকালে তো খবরের কাগজ আসে না। তুমি শুধু শুধু জিজ্ঞেস করছ কেন?

'তোমাকে রাগিয়ে দেবার জন্যে জিজ্ঞেস করছি। তুমি যে কত অল্পতে রেগে যাও তা তুমি জান না। যাতে জানতে পার সে জন্যে ছোট খাট দু' একটা ব্যাপার করে তোমাকে রাগাই।'

রওশন আরা টি পট নিয়ে উঠে গেলেন। চা ঠান্ডা হয়ে গেছে। নতুন এক পট চা বানাবেন। ঘরে বেশ কয়েকজন কাজের মানুষ আছে, তারপরেও রান্না বান্নার সব কাজ তিনি নিজে করেন। রান্না বান্নার ব্যাপারে তাঁর সামান্য শুচিবায়ুর মত আছে।

কুড়ি মিনিট পার হয়ে গেছে স্বাতী নীচে নামছে না। রওশন আরা আবার উঠে গেলেন। স্বাতীর ঘরের দরজা খোলা। সে সাদা ফুল দেয়া নীল রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে। চুল আঁচড়াচ্ছে। তার মুখ হাসি হাসি। স্বাতী বলল, 'মা, বাবা কি বারান্দায় বসে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'বাবাকে চমকে দেয়ার একটা ব্যবস্থা করি। তুমি বাবাকে বল যে আমি বিছানায় শুয়ে কাঁদছি। বাবা আমার খোঁজে আসবে। এর মধ্যে আমি করব কি কোল বালিশটা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখব। মনে হবে আমি শুয়ে আছি। বাবা চাদর টেনে তুলতে যাবে আমি পেছন থেকে বাবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। কেমন হবে মা?'

'ভালই হবে।'

'ড্রাইভার চাচা এসেছে মা?'

'এসেছে বোধ হয়।'

'ড্রাইভার চাচার হাত দিয়ে আমি আমার বান্ধবী লিলিকে একটা চিঠি পাঠাব। চিঠি লিখে রেখেছি। ড্রাইভার চাচার হাতে পাঠিয়ে দাও।'

'এখন পাঠাবি? সাতটাও বাজেনি।'

'লিলি খুব ভোরে ওঠে মা।'

'আচ্ছা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'লিলিকে আসতে বলেছি। জন্মদিন উপলক্ষে আমরা দু'জন সারাদিন হৈ চৈ করব। চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাঁদর দেখব।'

'চিড়িয়াখানায় বাঁদর দেখতে হবে কেন?'

'বাঁদরের জন্যেই তো মানুষ হয়ে জন্মাতে পেরেছি। এই জন্যে বাঁদরদের থ্যাংকস দিতে আসব।'

রওশন আরা স্বস্তি বোধ করছেন। স্বাতী স্বাভাবিক অবস্থায় চলে এসেছে। তিনি চিঠি হাতে নীচে নামছেন। স্বাতী আগের পরিকল্পনা ভুলে গিয়ে মা'র পেছনে নেমে আসছে। সিঁড়ি পর্যন্ত আসতেই নাজমুল সাহেব বললেন, 'হাই লিটল ড্যানসার, আমার ছোট্ট নর্তকী, হ্যাপী বার্থ ডে। শুভ জন্মদিন।'

স্বাতী সিঁড়ির মাঝামাঝি থেকে প্রায় উড়ে আসছে। নাজমুল সাহেব চট করে উঠে দাঁড়ালেন। তার এই মেয়েটার অভ্যাস হচ্ছে বেশ অনেকখানি দূর থেকে গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। ছোট বেলাতেই মেয়ের এই ঝাঁপিয়ে পড়া সামলাতে পারতেন না। এখন মেয়ে বড় হয়েছে, তাঁরও বয়স হয়েছে। তাঁর ভয় হচ্ছে মেয়ে সহ তিনি না গড়িয়ে পড়ে যান। মেয়েকে এই ভাবে ছুটে আসতে দেখলেই অনেকদিন আগের একটা ছবি তাঁর মনে হয়।

স্বাতী তখন ক্লাস টু-তে পড়ে। স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন অনুষ্ঠান। স্বাতী সেখানে নাচবে। সে একা না, তার সঙ্গে ন'টি মেয়ে আছে। নাচের নাম- এসো হে বসন্ত। তারা সবাই

হলুদ শাড়ি পরেছে। মাথায় ফুলের মুকুট। গলায় ফুলের মালা।

নাজমুল সাহেব মুগ্ধ দর্শক। দর্শকদের সঙ্গে প্রথম সারিতে বসে আছেন। খুব আফসোস হচ্ছে কেন ক্যামেরা নিয়ে এলেন না। নাচের শুরুতেই একটা ঝামেলা হয়ে গেল, স্বাতীর মাথা থেকে ফুলের মুকুট পড়ে গেল। দর্শকরা হেসে উঠেছে। স্বাতী মুকুট কুড়িয়ে মাথায় পরার চেষ্টা করছে। অন্যরা নেচে যাচ্ছে। তিনি লক্ষ করলেন স্বাতীর চোখে পানি। সে এক হাতে পানি মুছল। তারপর মুকুটটা ঠিক করল। ঠিক করে আবার নাচ শুরু করতে গেছে– আবার মুকুট পড়ে গেল। দর্শকদের হাসির বন্যা আরো উঁচুতে উঠল। স্বাতী আবারও মুকুট কুড়িয়ে পরতে শুরু করল। এবার মুকুটটা পরল উল্টো করে। নাচের চেয়ে ছোট মেয়েটির কাণ্ড কারখানায় দর্শকরা অনেক বেশি মজা পাচ্ছে। তাদের হাসি আর থামছে না। স্বাতী কাঁদছে। সে চোখের পানি মুছে আবার নাচতে গেল। ততক্ষণে নাচ শেষ হয়ে গেছে। স্বাতী বাবার দিকে তাকিয়ে উঁচু গলায় ডাকল, বাবা!

নাজমুল সাহেব স্টেজের দিকে এগিয়ে এলেন আর তখন এই মেয়ে আচমকা স্টেজ থেকে তাঁর উপর লাফিয়ে পড়ল। তিনি এই ধাক্কা সামলাতে পারলেন না। মেয়েকে নিয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন।

আজ মেয়ে সেদিনের মতই ঝাঁপিয়ে পড়ল। আজ তিনি সেদিনের মতই গাঢ় গলায় বললেন, 'মাই লিটল ড্যান্সার। মাই লিটল ড্যান্সার। আমার ছোট্ট নর্তকী, হ্যাপী বার্থ ডে টু ইউ।'

রওশন আরার একটু মন খারাপ লাগছে। কারণ ঝাঁপিয়ে পড়ার এই ব্যাপারটি স্বাতী শুধু তার বাবার সঙ্গেই করে। তাঁর সঙ্গে করে না।

তিনি চিঠি হাতে ড্রাইভারের খোঁজে গেলেন। ড্রাইভার এখনও আসেনি। আজ শুক্রবার ছুটির দিন। ছুটির দিনে ড্রাইভার দশটার আগে আসে না। খাম বন্ধ চিঠি। আঠা এখনও শক্ত হয়ে লাগেনি। খাম খুলে চিঠি পড়ে দেখলে কেমন হয়? ব্যাপারটা অন্যায়। বড় ধরনের অন্যায়। তবু মা'দের এই সব অন্যায় করতে হয়। তিনি একটু আড়ালে গিয়ে চিঠি পড়লেন। স্বাতী লিখেছে–

প্রিয় লিলি ফুল,

আজ যে আমার জন্মদিন তোর কি মনে আছে? তুই কি পারবি আসতে? ছুটির দিনে তোকে বাড়ি থেকে বের হতে দেয় না তা জানি। তবু একবার চেষ্টা করে দেখ। তোর বাবাকে বল টিউটোরিয়াল পরীক্ষার জন্যে আমার সঙ্গে ডিসকাস করে পড়া দরকার। ও আচ্ছা, ভুলেই গেছি তুই তো আবার সত্যবাদী! মিথ্যা বলতে পারিস না। তাহলে বরং সত্য কথাই বল। বল– আমার বান্ধবীর জন্মদিন। শুধু তাকে শুভ জন্মদিন জানিয়ে চলে আসব। মাত্র এক ঘণ্টার 'ভিসা' দিন।

লিলি তোর আসা খুব দরকার। আমি ভয়ংকর একটা অন্যায় করেছি। অন্যায়টা চাপা দেবার জন্যে এখন আমাকে আরো কয়েকটা ছোটখাট অন্যায় করতে হবে। তোর সঙ্গে আলাপ করা দরকার।

ইতি স্বাতী নক্ষত্র

রওশন আরা চিঠিটা দু'বার পড়লেন। তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। তিনি কাঁপা কাঁপা হাতে খাম বন্ধ করলেন। ফিরে এলেন চায়ের টেবিলে। স্বাতী ঝলমলে মুখে কাপে চা ঢালছে।

রওশন আরা বললেন, 'ড্রাইভার এখনও আসেনি। আজ শুক্রবার তো দশটার আগে আসবে না।'

স্বাতী বলল, 'দশটার সময় পাঠিও। আর শোন মা, চিঠিতে কি লেখা সেটা পড়ে তুমি এমন হকচকিয়ে গেছ কেন? ইন্টারেস্টিং কিছু না লিখলে লিলি আসবে না। ওকে আনার জন্যে এইসব লিখেছি।'

নাজমুল সাহেব বললেন, 'কি নিয়ে কথা হচ্ছে?'

স্বাতী বলল, 'বাবা তুমি বুঝবে না। মাতা ও কন্যার মধ্যে কথা হচ্ছে। যা তা কি তোমাকে?'

রওশন আরা বললেন, 'সে।'

রওশন আরা মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার মেয়ে তাঁকে ঠিক কথা বলেনি। কিছু একটা হয়েছে। ভয়ংকর কিছু।

লিলি ভাল ঘুমুতে পারেনি। তিন চার বার ঘুম ভেঙেছে। বিশ্রী বিশ্রী সব স্বপ্ন দেখেছে। একটা স্বপ্ন ছিল ভয়াবহ। তার যেন বিয়ে হচ্ছে। সেজে গুজে বিয়ের আসরে সে বসে আছে, হঠাৎ গুন্ডা ধরনের একটা ছেলে দৌড়ে ঢুকল। তার হাতে কয়েকটা জর্দার কৌটা। সে বলল, খবর্দার কেউ নড়বে না। বোম মেরে উড়িয়ে দেব। চারদিকে কান্নাকাটি, হৈ চৈ। এর মধ্যে বোমা ফাটা শুরু হয়েছে। দৌড়ে পালাতে গিয়ে দরজার কাছে হুমড়ি খেয়ে লিলি পড়ে গেছে। বাতী এসে তাকে তুলল। বাতী বলল, চল পালাই। লেট আস রান। রান বেবী রান।

তারা দু'জনই দৌড়াচ্ছে। বাতীর গা ভর্তি ঝলমলে গয়না। গয়না থেকে ঝন ঝন শব্দ আসছে। লিলি ভাবছে, বিয়ে হচ্ছে তার, আর বাতীর গায়ে এত গয়না কেন?

রাতের ভয়ংকর স্বপ্ন সাধারণত দিনে হাস্যকর লাগে। এই স্বপ্নটা লাগছে না। ভোরবেলা দাঁত মাজতে মাজতে লিলির মনে হল- স্বপ্নটার কোন খারাপ অর্থ নেই তো? মা'র কাছে খাব-নামার একটা বই আছে। বই থেকে স্বপ্নের কোন অর্থ পাওয়া যাবে?

লিলি অনেকক্ষণ সময় নিয়ে দাঁত মাজল। আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে দাঁত ব্রাশ করার আলাদা আনন্দ। তবে আজ আয়নায় নিজেকে দেখতে ভাল লাগছে না। ঘুম না হওয়ায় চোখ লাল হয়ে আছে। চেহারাটাও কেমন শুকনা শুকনা লাগছে।

বাথরুম থেকে বের হয়ে লিলি ইতস্তত করতে লাগল। সে কি এক তলায় যাবে? নাশতা দেয়া হয়েছে কি না দেখবে? না নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বই নিয়ে বসবে? আজ বই নিয়ে বসলেও লাভ হবে না। মাথায় পড়া ঢুকবে না। তারচে নীচে যাওয়াই ভাল। নীচে যাওয়া মাত্র এই বাড়ির প্রবল স্রোতের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। মিশতে ইচ্ছা করে না। পৃথিবীতে বাস করতে হলে ইচ্ছে না থাকলেও অনেক কিছু করতে হয়।

লিলি তার বড় চাচার ঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল।

বড় চাচা আজহার উদ্দিন খাঁ সাহেবের দরজা ভেজানো। ভেতর থেকে সিগারেটের গন্ধ আসছে। অর্থাৎ তিনি জেগে আছেন। তিনি জেগে থাকলে বিরাট সমস্যা, তাঁর বন্ধ দরজার সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি প্রায় অলৌকিক উপায়ে টের পেয়ে যাবেন এবং শ্লেষ্মা জড়ানো ভারী গলায় ডাকবেন, কে যায়? লিলি না? মা, একটু শুনে যা তো!

এই ডাকার পেছনে কোন কারণ নেই। অকারণে ডাকা।

'পর্দাটা টেনে দে তো।'

'ক'টা বাজছে দেখ তো।'

তাঁর ঘরের দেয়ালেই ঘড়ি, তিনি মাথা হেলিয়ে ঘড়ি দেখতে পারেন। হাত বাড়ালেই পর্দা। পর্দা টানার জন্যে বাইরের কাউকে ডাকতে হয় না। এমন না যে তাঁর ঘাড়ে ব্যথা, মাথা ঘুরাতে পারেন না, কিংবা হাতে প্যারালিসিস হয়েছে, হাত বাড়িয়ে পর্দা ছুঁতে পারেন না।

আজও লিলি বড় চাচার ঘরের সামনে দিয়ে পা টিপে টিপে যাচ্ছিল- বড় চাচা ডাকলেন, 'শুনে যা।'

লিলি মুখ কালো করে ঘরে ঢুকল।

'এক তলায় হৈ চৈ হচ্ছে কেন?'

লিলি কি করে বলবে কেন? বড় চাচা যেমন দোতলায় লিলিও তেমনি দোতলায়।

'ভোর বেলাতেই হৈ চৈ চেঁচামেচি। দেখে আয় তো ব্যাপারটা কি?'

লিলি ব্যাপার দেখার জন্যে নীচে নেমে এসে হাঁপ ছাড়ল। বড় চাচার বেলায় একটা সুবিধা হচ্ছে তাঁর স্মৃতিশক্তি নেই বললেই হয়। একতলার হৈ চৈ-এর কারণ লিলিকে আবার ফিরে গিয়ে জানাতে হবে না। তিনি এর মধ্যে ভুলে যাবেন। এমন ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির একটা মানুষ এত বড় সরকারী চাকরি দীর্ঘদিন কি করে করলেন সে এক রহস্য। কে জানে সরকারী চাকরিতে হয়তো বা স্মৃতিশক্তির কোন ভূমিকা নেই। এই জিনিস যার যত কম থাকবে সে তত নাম করবে।

একতলায় হৈ চৈ-এর কারণ জানার কোন আগ্রহ লিলির ছিল না। কিন্তু হৈ চৈ-টা এমন পর্যায়ের যে আগ্রহ না থাকলেও জানতে হল। তাদের দুধওয়ালার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। গতকাল সে তিন লিটার দুধ দিয়েছিল। সেই দুধ জ্বাল দেবার পর সেখানে একটা মরা তেলাপোকা পাওয়া গেছে। লিলিদের বুয়া সেই তেলাপোকা প্রমাণস্বরূপ খানিকটা দুধসহ একটা গ্লাসে রেখে দিয়েছে। প্রমাণসহ মামলা। দুধওয়ালা প্রমাণ গ্রাহ্য করছে না। অতি মিহি ভাষায় সে বলছে- তেইল্যাচুরা জন্মেও দুধ খায় না।

লিলির ছোট চাচা জাহেদুর রহমান ফরিয়াদী পক্ষের উকিলের মত ঠান্ডা গলায় বলল, 'তেলাপোকা দুধ খায় না?'

'জ্বে না স্যার?'

'সে কি খায়?'

'তেল খায়। এই জন্যে এর নাম তেইল্যাচুরা।'

'দুধ খাক বা না খাক তোমার আনা দুধের মধ্যে তাকে পাওয়া গেছে।...'

লিলির গা ঘিনঘিন করছে। তেলাপোকা তার কাছে জগতের কুৎসিৎ প্রাণীদের একটি। তার মন বলছে গতকাল বিকেলে এই তেলাপোকা ভেজানো দুধই তাকে খেতে দেয়া হয়েছে। পুরো এক গ্লাস। তাদের বাড়ি এমন না যে সামান্য তেলাপোকার কারণে পুরো তিন লিটার দুধ ফেলে দেয়া হবে। লিলি রান্নাঘরে তার মাকে ধরল। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'মা কাল বিকেলে তুমি যে আমাকে দুধ খেতে দিলে সেটা কি তেলাপোকা মাখা দুধ?'

ফরিদা পেঁপের হালুয়া বানাচ্ছেন। তিনি চোখ না তুলেই বললেন, 'আরে না। কি যে তুই বলিস।'

'কাল যে দুধ খেলাম সেটা কোন দুধ?'

'তার আগের দিনের দুধ। ফ্রীজে তোলা ছিল। তোকে গরম করে দিয়েছি।'

'তেলাপোকার দুধ কি করেছ?'

ফরিদা বিরক্ত মুখে বললেন, 'তোকে খেতে দেইনি বললাম তো। কেন অকারণ ঘ্যানঘ্যান করছিস?'

লিলির বমি বমি লাগছে। রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে। কী অবলীলায় মা মিথ্যা বলে যাচ্ছেন। মিথ্যা বলার সময় তাঁর মুখের চামড়া পর্যন্ত কুঁচকাচ্ছে না।

ফরিদা বললেন, 'লিলি যা তো, তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করে আয় চা খাবে নাকি। কাল রাতে বেচারা যা কষ্ট করেছে। পেটে গ্যাস হয়েছে। গ্যাস বুকে চাপ দিচ্ছে। এই বয়সে গ্যাস ভাল কথা না। গ্যাস থেকে হার্টের ট্রাবল হয়।'

লিলি বলল, 'তেলাপোকার দুধ কি করেছ?'

ফরিদা চোখ তুলে তাকালেন। তাঁর চোখে বিরক্তি নেই, আনন্দও নেই। পাথরের মত চোখ মুখ। দীর্ঘদিন সংসারে থাকলে মায়েরা রোবট জাতীয় হয়ে যান। কোন কিছুই তাদের স্পর্শ করে না। ফরিদা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'যন্ত্রণা করিস না লিলি।'

'যন্ত্রণা করছি না মা। দুধটা তুমি কি করেছ বল। ফেলে দিয়েছ?'

'না।'

'তাহলে কি করেছ?'

'বুয়ারা খেয়ে ফেলেছে।'

'তিন পিটার দুধ দু'জনে মিলে খেয়ে ফেলেছে?'

ফরিদা এইবার চোখ মুখ করুণ করে বললেন, 'তোর বাবা চা খাবে কিনা জিজ্ঞেস করে আয়। লক্ষী মা।'

লিলি বাবার ঘরের দিকে রওনা হল। তিনিও দোতলায় থাকেন। তবে তাঁর ঘর বড় চাচার ঘরের উল্টো দিকে। আবার বড় চাচার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই, তবে সিঁড়ি দিয়ে খুব সাবধানে উঠতে হবে। বড় চাচা পায়ের শব্দও চেনেন। পায়ের শব্দ শুনেই ডেকে বলতে পারেন, 'যাচ্ছে কে লিলি না? একটু শুনে যা মা।'

লিলির বাবা নেয়ামত সাহেব জেগে আছেন। খালি গা, লুঙ্গি হাঁটুর উপর উঠে এসেছে। মুখ ভর্তি কাঁচা পাকা দাড়ি। চোখের নীচে কালি। দু' চোখের নীচে না, এক চোখের নীচে। মানুষের দু' চোখের নীচে কালি পড়ে। তাঁর কালি পড়ে শুধু ডান চোখের নীচে। তাঁর বোধ হয় একটা চোখ বেশি ক্লান্ত হয়। কেমন অসুস্থ অসুস্থ চেহারা।

'চা খাবে বাবা?'

নেয়ামত সাহেব চোখ মুখ কুঁচকে বললেন— 'হাত মুখ কিছু ধুইনি, চা খাব কি? সব সময় ইডিয়েটের মত কথা।'

'মা জানতে চাচ্ছিল চা খাবে কি না।'

'খবরের কাগজ দিয়ে যা।'

'কাগজ এখনো আসেনি।'

'ন'টা বাজে এখনো কাগজ আসেনি? হারামজাদা হকারকে ধরে মার লাগানো দরকার। শুওরের বাচ্চা...'

লিলি বাবার ঘর থেকে বের হয়ে এল। কি বিশ্রী পরিবেশ চারদিকে। কোন আনন্দ নেই। একটা হট্টগোলের বাড়ি। যে বাড়িতে কিছুক্ষণ থাকলেই মাথা ধরে যায়। যে বাড়িতে অনেকগুলি মানুষ বাস করে কিন্তু কারো সঙ্গেই কারো যোগ নেই। যে বাড়ির মানুষগুলি সুন্দর করে, শুদ্ধ করে কথা বলা কি জানে না।

একতলায় ভেতরের বারান্দায় রুমু ঝুমুর স্যার তাঁর ছাত্রীদের নিয়ে বসেছেন। দু'জনেই ক্লাস এইটে পড়ে। এবার নাইনে পড়ার কথা ছিল। এক সঙ্গে ফেল করায় এইটে। প্রাইভেট মাস্টারের ব্যবস্থা করে রুমু ঝুমুর প্রতি দায়িত্ব শেষ করা হয়েছে। এই প্রাইভেট মাস্টার না-কি দারুণ ভাল। 'গেরেন্টি' দিয়ে পড়ায়। একটা বেতের চেয়ারকে সে যদি তিন মাস এক নাগাড়ে পড়ায় তাহলে বেতের চেয়ারও ফিফটি পার্সেন্ট নম্বর পেয়ে পাশ করে যাবে। অঙ্কে পাবে সেভেন্টি পার্সেন্ট।

এই মাস্টারের তেমন কোন বিশেষত্ব লিলির চোখে পড়েনি। সে দেখেছে মাস্টার সাহেব কারো চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেন না। তিনি যতক্ষণ পড়ান ততক্ষণই মাথা নিচু করে থাকেন। এবং ততক্ষণই অতি কুৎসিৎ ভঙ্গিতে নাকের ভেতর থেকে লোম ছেঁড়ার চেষ্টা করেন। রুমু ঝুমু এই কুৎসিৎ দৃশ্য কিভাবে সহ্য করে লিলি জানে না। রুমু ঝুমুর জায়গায় সে হলে ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে যেত। মাস্টার সাহেবকে খুন টুন করে ফেলত।

রুমু ঝুমু দু'জনই বিচিত্র স্বভাবের মেয়ে। ঝুমু লিলির ছোট বোন, রুমু বড় চাচার এক মাত্র মেয়ে। এরা দু'জন সারাক্ষণ এক সঙ্গে থাকে। কেউ কাউকে চোখের আড়াল করে না। তবে তারা যে গল্প গুজব করে তা না। কারো মুখে কোন কথা নেই। নিঃশব্দ চলাফেরা। মাঝে মাঝে তারা কোন একটা বিশেষ ধরনের অন্যায় করে তখন ফরিদা দু'জনকে ঘরে নিয়ে আটকান। দরজা জানালা বন্ধ করে বেদম মারেন। মারতে মারতে নিজেই ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বের হয়ে আসেন। এরা টুঁ শব্দ করে না। নিঃশব্দে মার খায়। লিলি যদি জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে মা? তিনি ক্লান্ত গলায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, 'কিছু হয়নি।'

'ওদের মারলে কেন?'

'সারাক্ষণ মুখ ভোতা করে থাকে। মুখে কথা নেই, মারব না তো কি?'

মায়ের কথা লিলির কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। সারাক্ষণ মুখ ভোতা করে রাখা, কারো সঙ্গে কথা না বলা এমন কোন অপরাধ না যার জন্য দরজা জানালা বন্ধ করে মারতে হয়। রুমু ঝুমুকে জিজ্ঞেস করলেও কিছু জানা যাবে না। এরা মরে গেলেও মুখ খুলবে না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মাথা নিচু করে ফেলবে। ফিক ফিক করে হাসবে।

লিলি প্রায়ই ভাবে তাদের যদি আলাদা একটা বাড়ি থাকতো। ছোট্ট একতলা একটা বাড়ি। দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সামনে অনেকখানি জায়গায় নানান ধরনের ফুল গাছ। পেছনে সব বড় বড় গাছ— আম, জাম, কাঁঠাল। একটা গাছে দোলনা ঝুলানো। বাড়িটা একতলা হলেও ছাদে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ছাদে অসংখ্য টবে ফুল গাছ। সেই বাড়িতে কোন কাজের লোক নেই। শুধু তারাই থাকে। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা ঘর। তারা খেতে বসে এক সঙ্গে এবং খাবার টেবিলে নানান গল্পগুজব করে। বাবা বলেন, তাদের অফিসে মজার কি ঘটল সেই গল্প। লিলি বলে, তার ইউনিভার্সিটির গল্প। ইউনিভার্সিটির কত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা আছে। সেই ঘটনা শোনার মানুষ নেই। ঐ বাড়িটার পরিবেশ এমন হবে যে সবাই সবার গল্প শুনবে। কারো মজার কোন কথা শুনে সবাই একসঙ্গে হো হো করে হাসবে।

কোন কোন দিন খুব বৃষ্টির সময় এক সঙ্গে সবাই ছাদে গিয়ে ভিজবে। বছরে একবার তারা বেড়াতে বের হবে। কক্সবাজার, রাঙামাটি, কুয়াকাটা, সিলেটের চা বাগান। বাড়ির সুন্দর

একটা নাম থাকবে– "আয়না ঘর'' বা এই জাতীয় কিছু...

ত'দের এখনকার এই বাড়িতে কোন দিন এরকম কিছু হবে না। এই বাড়ির মা নির্বিকার ভঙ্গিতে তেলাপোকা চোবানো দুধ খাইয়ে দেবেন। বাবা হাঁটুর উপর লুঙ্গি তুলে চেঁচামেচি করবেন খবরের কাগজের জন্য। রুনু ঝুনুর মাষ্টার নাকের লোম ছিঁড়তে ছিঁড়তে পা দোলাবে। বড় চাচা সামান্য পায়ের শব্দেই কান খাড়া করে ডাকবেন– কে যায়? লিলি? জানালার একটা পাল্লা খুলে দিয়ে যা তো।

তাদের বর্তমান বাড়ি লিলির দাদাজান ইরফানুদ্দিন খাঁর বানানো। বাড়ি যেমন কুৎসিৎ, বাড়ির নামও কুৎসিৎ রহিমা কুটির– রহিমা তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম।

লিলির ধারণা তার দাদাজান সবার একটা তরফের ক্ষতি করে বেহেশত কিংবা দোজখ কোন এক জায়গায় চলে গেছেন। দোজখ হবার সম্ভাবনাই বেশি। তিনি ছিলেন ইনকামট্যাক্স অফিসের হেড ক্লার্ক। এই চাকরি থেকে করেননি হেন জিনিস নেই।

কয়েকটা বাড়ি বানালেন। ট্রাক কিনলেন, বাস কিনলেন। পঞ্চাশ বছর বয়সে আবার বিয়ে করলেন। চৌদ্দ বছর বয়সের এক খুকি।

তাঁর একটা হিন্দু কাজের মেয়ে ছিল। রেবতী। একদিন দেখা গেল তার নামেও কলতা বাজারের বাড়িটা লিখে দিলেন। সেই খুকির নামে বাড়ি লিখে দিলেন। দরাজ গলায় বললেন, এর আত্মীয় স্বজন সব ইন্ডিয়া চলে গেছে– এ যাবে কোথায়? খাবে কি? জীবনে সৎকাজ তো কিছু করি নাই। একটা করলাম আর কি। ক্ষুদ্র একটি সৎ কর্ম। হা হা হা।

এইসব ঘটনা লিলি দেখেনি, শুনেছে। দাদাজান যখন মারা যান তখন লিলি ক্লাস সিক্সে পড়ে। পরদিন ভূগোল পরীক্ষা, দরজা বন্ধ করে পড়ছে। বাবা এসে ডেকে নিয়ে গেলেন। তখন দাদাজানের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয় তখন কথা বলেন। সব কথাবার্তাই কি ভাবে আরো কিছুক্ষণ বেঁচে থাকা যায় সেই বিষয়ে...

'খাঁটি মৃগনাভি পাওয়া যায় কি না দেখ। মৃগনাভি মধুর সঙ্গে বেটে খাওয়ালে জীবনী শক্তি বাড়ে।'

মৃগনাভির সন্ধানে হেকিমী ওষুধের দোকানে লোক গেল। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'রাতটা কোন রকমে পার করে দিতে পারলে আর চিন্তা নাই। আজরাইল কখনো দিনে জান কবজ করে না। আজরাইল জান কবজ করে রাতে।'

তিনি রাতটা টিকে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। আশা ছেড়ে দিলেন। ততক্ষণে মৃগনাভি পাওয়া গেছে। মরা মানুষের শুকনা চামড়ার মত এক টুকরা চামড়া যার মধ্যে লোম লেগে আছে। মৃগনাভি থেকে কড়া অডিকোলনের মত গন্ধ আসছে। তিনি বললেন, 'মৃগনাভি রেখে দে, লাগবে না। কোরান মজিদ নিয়ে আয়।'

কোরান শরীফ আনা হল। তিনি তাঁর ছেলেদের বললেন– কোরান মজিদে হাত রেখে তোমরা প্রতিজ্ঞা কর ভাইয়ে ভাইয়ে মিল–মহব্বত রাখবে। তিন ভাই এক বাড়িতে থাকবে এবং আমার মৃত্যুর কারণে বেকুবের মত চিৎকার করে কাঁদবে না। তিন ভাই মিলে তখনই কান্নাকাটি শুরু করল। হৈ চৈ এবং ঝামেলার এক ফাঁকে আজরাইল টুক করে জান কবজ করে ফেলল।

লিলি তার বাপ–চাচার মত পিতৃভক্ত মানুষ এখনো দেখেনি। কী অসীম শ্রদ্ধা ভক্তি। বিরাট এক অয়েল পেইনটিং বসার ঘরে লাগান। সবার ঘরের যাবতীয় আসবাবে ধুলা জমে আছে

কিন্তু পেইনটিং–এ ধুলা নেই। সব সময় ঝক ঝক করছে। পেইনটিং দেখলে যে কেউ বলবে– পুরানো দিনের কোন ছোটখাট শুকনা মহারাজা। যার প্রচণ্ড দাঁতে ব্যথা বলে মুখ আপাতত বিকৃত।

নেয়ামত সাহেব তাঁর ছেলেমেয়ের জন্ম তারিখ জানেন না। নিজের বিয়ের তারিখ জানেন না। অথচ তাঁর বাবা মুনশি ইরফানুদ্দিন খাঁ সাহেবের মৃত্যু তারিখ ঠিকই জানেন। ঐদিন বাড়িতে বাদ আছর মিলাদ হয়। রাতে গরীব মিসকিন খাওয়ানো হয়। এতিমখানায় খাসি দেয়া হয়। নেয়ামত সাহেব পায়জামা–পাঞ্জাবি পরে অনেক রাত পর্যন্ত কোরান পাঠ করেন। রাতে খেতে বসে ঘন ঘন বলেন, গ্রেটম্যান ছিলেন, কর্মযোগী পুরুষ। এরকম মানুষ হয় না। কি দরাজ দিল, কি বুদ্ধি, ওহ ওহ...। বাবার সৎ গুণের কিছুই পেলাম না। বড়ই আফসোস।

পিতৃভক্ত ছেলেদের মুখে মায়ের নাম তেমন শোনা যায় না। মা–র মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হয় না। কেন হয় না লিলি জানে না। লিলি এ মহিলাকে খুব ছোটবেলায় দেখেছে– সেই স্মৃতি তার মনে পড়ে না। দু'নম্বর দাদীজান বেঁচে আছেন। তাঁর কোন ছেলেপুলে হয়নি। তিনি তাঁর ভাইদের সঙ্গে আলাদা থাকেন। যদিও কাগজপত্রে লিলিরা যে বাড়িতে থাকে সেই বাড়িটা তাঁর।

এই মহিলার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হলেও চেহারায় খুকি খুকি ভাব আছে। স্বামীর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে তিনি লিলিদের বাড়িতে আসেন। তাঁকেও ভালই খাতির যত্ন করা হয়। লিলির কাছে খুব আশ্চর্য লাগে, এই মহিলাও দারুণ স্বামী ভক্ত। লিলিকে ফিসফিস করে বলেন, 'অসাধারণ একটা মানুষ ছিলরে লিলি। অসাধারণ।'

'কোন দিক দিয়ে অসাধারণ?'

'সব দিক দিয়ে।'

'কাজের মেয়েকে বাড়ি লিখে দিলেন তারপরও অসাধারণ?'

'লিখে দিয়েছে বলেই তো অসাধারণ। কাজের মেয়ের সঙ্গে কতজন কত কিছু করে। কে আর বাড়ি ঘর লিখে দেয়।'

'আপনার এইসব ভেবে অস্বস্তি লাগে না?'

'মেয়েদের এত অস্বস্তি লাগলে চলে না। পুরুষ মানুষ এরকম হবেই। আদরে আদরে ছোঁক ছোঁক স্বভাব হয়। দোষটা স্বভাবের– মানুষের না।'

'কি যে আপনি বলেন দাদীজান। মানুষ আর তার স্বভাব বুঝি আলাদা?'

'অবশ্যি আলাদা। ইউনিভার্সিটি পড়ে এইসব বুঝবি না। এইসব তো আর ইউনিভার্সিটিতে শেখায় না। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করবি। সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তুই তোর দাদাজানের বুদ্ধি খানিকটা পেয়েছিস, তুই বুঝতে পারবি। তোর বাপ–চাচার কেউ তাঁর বুদ্ধি পায়নি। সব ক'টা ছাগল মার্কা হয়েছে। বুদ্ধি–শুদ্ধি চলাফেরা, কাজকর্ম সবই ছাগলের মত। সবচে বড় ছাগল হচ্ছে তোর বড় চাচা। জ্ঞানী ছাগল। ওর পাশ দিয়ে গেলে ছাগলের বোটকা গন্ধ পাওয়া যায়।'

বড় চাচা সম্পর্কে দাদীজানের এই কথাগুলি লিলির সত্যি মনে হয়। বড় চাচার কারণে লিলিরা দ্রুত পথে বসতে বসেছে। এই সত্য স্বীকার করা ছাড়া এখন আর পথ নেই। বিষয় সম্পত্তি সব দেখার দায়িত্ব তাঁর। তাঁকেই পাওয়ার অব এটর্নী করে সেই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তিনি একে একে সব বিক্রি করছেন। অন্য দুই ভাই এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। সংসার ঠিকমত চলছে, খাওয়া–দাওয়ার কোন সমস্যা হচ্ছে না, কাজেই অসুবিধা কি? অসুবিধা হোক,

জায়গা দেখা যাবে। তা ছাড়া মুনশি ইরফানুদ্দিন খাঁ মৃত্যুর সময় বলে গেছেন, ভাইয়ে ভাইয়ে মিল মহব্বত রাখবে। পিতৃ আজ্ঞার অন্যথা হয়নি। ভাইয়ে ভাইয়ে মিল মহব্বত আছে। ভালই আছে।

এই বাড়ি হল অসুবিধাহীন বাড়ি। এ বাড়িতে কারোরই অসুবিধা হয় না। সবাই ভাল থাকে। সুখে থাকে। কারো অসুখ হলে ডাক্তার চলে আসে। বাসায় এসে রুগী দেখে যায়। ডাক্তার হল বড় চাচার বন্ধু সামছুদ্দিন তালুকদার, হোমিওপ্যাথ। এক সপ্তাহ তাঁর চিকিৎসা চলে। এক সপ্তাহে কিছু না হলে অন্য ডাক্তার, রমজান আলি, এলোপ্যাথ।

লিলির বড় চাচার নিয়মে হোমিওপ্যাথির জন্যে এক সপ্তাহ দিতে হবে। এক সপ্তাহে রোগ যত প্রবলই হোক অন্য চিকিৎসা হবে না। সাত দিন সময় না দিলে বোঝা যাবে না কেন ওষুধ কাজ করছে না। এলোপ্যাথি হল বিষ-চিকিৎসা। যত কম করান যায়।

তবে আজহার উদ্দিন খাঁ অবিবেচক নন। পরিবারের সদস্যদের সুবিধা অসুবিধা তিনি দেখেন। লিলির দিকে তাকিয়ে তিনি গাড়ি কিনলেন। সেই গাড়ি কেনার ইতিহাস হচ্ছে- লিলি একবার রিক্সা করে আসার সময় রিক্সা উল্টে পড়ে গেল। হাত কেটে রক্তারক্তি। হাসপাতাল থেকে সেলাই করিয়ে আনার পর আজহার উদ্দিন খাঁ বললেন, রিক্সা নিরাপদ না। বাচ্চাদের স্কুল-কলেজে যাতায়াতের জন্য গাড়ি দরকার। টু-ডোর কার, যাতে পেছনের দরজা হঠাৎ খুলে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকে।

আমাদের যা প্রয়োজন তা হল, একটা টু-ডোর কার এবং একজন বুড়ো ড্রাইভার। স্ত্রী যেমন যত বুড়ি হয় তত ভাল হয়, ড্রাইভারও তেমন। যত বুড়ো ততই অভিজ্ঞ।

এক সপ্তাহের মধ্যে লিলিদের গাড়ি চলে এল। ভক্সওয়াগন। রাস্তার সঙ্গে মিশে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলে। গাড়িতে ঢুকতেও হয় প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে। গাড়ির ড্রাইভারও দর্শনীয়, অতির-বুড়ো। এক চোখে ছানি পড়া, অন্য চোখেও ঝাপসা দেখে। সামনে কিছু পড়লে হর্ন দেয় না। জানালা দিয়ে মুখ বের করে অতি ভদ্র এবং অতিশালীন ভাষায় গালি দেয়- ঐ রিক্সা। গাড়ি আসতেছে শব্দ শুন না? নড় না কেন? গজব পড়বো। বুঝলা, গজব।

লিলি যদি বলে, আপনি হর্ন দেন না কেন ড্রাইভার চাচা? হর্ন দিতে অসুবিধা আছে?

ড্রাইভার উদাস গলায় বলে, অসুবিধা আছে গো মা। ব্যাটারীর যে অবস্থা হর্ন দিলে ব্যাটারী বসে যাবে। গাড়ি চলবে না। ব্যাটারীর কারেন্টের বার আনাই চলে যায় হর্নে। মানবজাতির দিকে তাকিয়ে দেখ মা, যে যত কথা বলে তত আগে তার মৃত্যু। কথা বলে বলে কারেন্ট শেষ করে ফেলে।

দার্শনিক ধরনের উক্তি। লিলির বলতে ইচ্ছে করে, আপনি যে হারে কথা বলেন তাতে আপনার কারেন্ট ছেলেবেলাতেই শেষ হয়ে যাবার কথা ছিল। শেষ তো হয়নি। যত বুড়ো হচ্ছেন কারেন্ট তত বাড়ছে।

কঠিন কিছু কথা বলতে ইচ্ছে হলেও লিলি শেষ পর্যন্ত কিছুই বলে না। তার কাউকে কিছু বলতে ভাল লাগে না। তাদের এই বিচিত্র সংসারে বড় হয়ে আজ তার এই সমস্যা হয়েছে। সব সময় মনে হয়- হোক যা ইচ্ছা। ড্রাইভার সারাক্ষণ কথা বলে- বলুক। কারেন্ট খরচ করুক।

লিলি কিছুক্ষণ দোতলার টানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ তার মাথা খানিকটা এলোমেলো হয়ে গেল। আজ কি বার মনে করতে পারল না। আজ কি তার ইউনিভার্সিটি আছে? সে কি কোন বিশেষ কারণে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে? হঠাৎ মনে হল মাস্টার সাহেব রুমু ঝুমুকে সকালে পড়াতে এসেছেন, কাজেই আজ শুক্রবার। একমাত্র শুক্রবারই তিনি সকালে আসেন। ইউনিভার্সিটিতে কোন ক্লাস নেই। লাইব্রেরীতে গিয়ে নোট করার কথাও নেই। আজ কোথাও যাওয়া যাবে না।

লিলি আবার একতলায় নেমে এল। কোথাও তার যেতে ইচ্ছে করছে। কোথায় যাওয়া যায়?

টেবিলে নাস্তা সাজানো হচ্ছে। গাদাখানিক রুটি। ভাজি। বড় এক বাটি পেপের হালুয়া। দিনের পর দিন একই নাশতা। এই নিয়েও কারো বিকার নেই।

একদিন একটু অন্য কিছু করলে হয়। লিলি ভাজি মুখে না দিয়েই বলে দিতে পারবে ভাজিতে লবণ বেশি হয়েছে। মতির মা বুয়া লবণ বেশি না দিয়ে ভাজি করতে পারে না। লবণ বেশি দেবে, বকা খাবে। মতির মা ধরেই নিয়েছে ভাজি নিয়ে বকা-ঝকা দিন শুরুর অংশ।

লিলির ছোট চাচা জাহেদুর রহমান লিলিকে দেখেই আনন্দিত গলায় বলল, 'হারামজাদার নাকে এক ঘুষি দিয়েছি, গলগল করে ব্লাড বের হয়ে এসেছে।'

'কার নাকে ঘুষি দিলে?'

'দুধওয়ালার নাকে। আমার সঙ্গে তর্ক করে। অন্যায় করেছ ক্ষমা চাও। ক্ষমা করে দেব। ক্ষমা মানব ধর্ম। তা না, তর্ক। হারামজাদার সাহস কত! রগে রগে সাহস। সাহস বের করে দিয়েছি।'

'সত্যি সত্যি মেরেছ?'

'অবশ্যই মেরেছি। দমাম করে ঘুষি। হারামজাদা, তুমি মানুষ চেন না। রোজ ভেলাগোলা খাওয়াও...।'

দুধওয়ালার নাক ভেঙে দিয়ে জাহেদুর রহমানকে অত্যন্ত উৎফুল্ল লাগছে। জাহেদুর রহমানের বয়স পঁয়ত্রিশের উপর। কিন্তু চলাফেরা হাব ভাব আঠারো-উনিশ বছরের তরুণের মত। সব সময় সেজে গুজে থাকে। প্যান্টের ভেতর সার্ট ইন করা। চকচকে জুতা। রঙ চঙে সার্টের কলারের নীচে সোনার চেইন ঝক ঝক করে। জাহেদুর রহমান গত সাত বছর ধরে ইমিগ্রেশন নিয়ে আমেরিকা যাবার চেষ্টা করছে। তার অধ্যবসায় দেখার মত। লিলির ধারণা তার ছোট চাচা যদি আমেরিকা যাবার জন্যে এখন পর্যন্ত কি কি করেছে তার একটা তালিকা করে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে পাঠায় তাহলে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তাকে সিটিজেনশীপ দিয়ে সম্মানের সঙ্গে আমেরিকা নিয়ে যাবেন।

লিলি বলল, 'ছোট চাচা তুমি আমাকে কিছু টাকা দিতে পারবে?'

জাহেদুর রহমান পা নাচাতে নাচাতে বলল, 'ফর গুড দিতে পারব না। ধার হিসেবে দিতে পারি।'

'ধার হিসেবেই দাও।'

'কত?'

'পাঁচশ।'

'এত টাকা দিয়ে করবি কি? পাঁচশ তো অনেক টাকা। প্রায় তেরো ডলার। তেরো ডলার দিয়ে তুই কি করবি?'

'রিকশায় করে শহরে চক্কর দেব। ফুর্তি! একদিনের জন্যে হিপ্পি হয়ে যাব। মহিলা হিপ্পি।'

'হিমুটা কে?'

'তুমি চিনবে না। দিতে পারবে পাঁচশ টাকা?'

'তিনশ দিতে পারব। বাকি দু'শ অন্যখান থেকে ম্যানেজ কর। ভাইজানকে গিয়ে বল ইউনিভার্সিটিতে পিকনিক হচ্ছে, দু'শ টাকা চাঁদা।'

'মিথ্যা কথা বলতে পারব না।'

'মিথ্যা কথাটা তুই এত ছোট করে দেখিস কেন লিলি। মিথ্যা আছে বলেই জগৎ সংসার এত সুন্দর। গাদা গাদা গল্প উপন্যাস যে পড়িস সবই তো মিথ্যা। লেখকেরা সত্যি কথা লেখা শুরু করলে বই আর পড়তে হত না। মিথ্যা কথা বলা না শিখলে লাইফ হেল হয়ে যাবে।'

লিলি হেসে ফেলল। জাহেদুর রহমান গম্ভীর গলায় বলল, 'হাসিস না। আমি হাসির কোন কথা বলছি না। সত্যি কথা হল ডিসটিল ওয়াটারের মত টেস্টলেস। আয় আমার সঙ্গে, টাকা নিয়ে যা।'

'কত দেবে, তিনশ?'

'পাঁচশ দেব। তোকে খুব পছন্দ করি। এই জন্যেই দিচ্ছি। তুই হচ্ছিস অনেস্ট একটা মেয়ে।'

লিলি হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি যে আমাকে পছন্দ কর তার কারণ হল আমি সব সময় সত্যি কথা বলি। আমি যদি তোমার মত মিথ্যা বলতাম তাহলে পছন্দ করতে না। কাজেই সত্যি বলার কিছু এ্যডভানটেজ আছে।'

জাহেদুর রহমান ছাদের চিলেকোঠায় থাকে। তার ঘর ছবির মত সাজানো। খাটে টানটান করে চাদর বিছানো। টেবিলের বইগুলি সুন্দর করে সাজানো। কোথাও এক কণা ধুলা নেই। জুতা বা স্যান্ডেল পরে তার ঘরে ঢোকা যাবে না। বাইরে খুলে ঢুকতে হবে। লিলি বলল, 'ঘরে ঢুকব না ছোট চাচা। আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি তুমি দিয়ে দাও।'

'আয়, একটু বসে যা।'

লিলি স্যান্ডেল খুলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'তোমার আমেরিকা যাবার কিছু হয়েছে?'

'নতুন একটা লাইন ধরেছি। ভাল লাইন। হয়ে যেতে পারে।'

'কি লাইন?'

'আমেরিকান এক মরমন পাদ্রীর সঙ্গে খাতির জমিয়েছি। প্রতি রোববারে যাই। এমন ভাব করি যেন যীশু খ্রীষ্টের অমর বাণী শোনার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি। তাকে পটাচ্ছি। সে ভাবছে সে আমাকে পটাচ্ছে।'

'তাকে পটিয়ে লাভ কি?'

'এক স্টেজে খ্রীষ্টান হয়ে যাব। তারপর তাকে বলব- আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধবরা এখন আমাকে মেরে ফেলার জন্যে ঘুরছে। আমাকে বাঁচাও। আমেরিকায় পাঠিয়ে দাও। পলিটিক্যাল এসাইলেমের ব্যবস্থা কর। বুদ্ধিটা তোর কাছে কেমন লাগছে?'

লিলি জবাব দিল না। জাহেদুর রহমান ড্রয়ার থেকে টাকা বের করতে করতে বলল, 'অনেক চিন্তা ভাবনা করে এগুচ্ছি। এইবার একটা কিছু হবেই।'

'যদি না হয় কি করবে?'

'আরো দু' বছর দেখব। এই দু'বছরে না হলে, আশা ছেড়ে দিয়ে বিয়ে-শাদী করব। ফেইথফুল সংসার করব। খাঁটি বাংলাদেশী হয়ে যাব। পয়লা বৈশাখে রমনা বটমূলে যাব। গব গব করে পান্তাভাত খাব।'

'আমেরিকা যাবে এই জন্যেই বিয়ে করছ না?'

'অবশ্যই। একজনেরই ব্যবস্থা হয় না দু'জনের কি ভাবে হবে? আমি ভিসা পেয়ে চলে গেলাম তোর চাচী দেশে পড়ে রইল, চোখের জল নাকের জল ক্রমাগত মিক্স করে যাচ্ছে। তখন অবস্থাটা কি হবে? নে, টাকা গুণে নে।'

'পাঁচশ টাকার নোট গুণে নেব কি?'

'তুলে দু'টা চলে গেল কি না দেখ। আর শোন লিলি, এই টাকা তোকে ফেরত দিতে হবে না। টাকাটা তোকে আমি উপহার হিসেবে দিলাম।'

'কেন?'

'এম্নি দিলাম। তুই হচ্ছিস একজন সত্যবাদী মহিলা...'

আজ সকাল থেকেই লিলির মন খারাপ হয়েছিল। এখন মন ভাল হতে শুরু করল। ছোট চাচার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেই তার মন ভাল হয়।

জাহেদুর রহমান একটু ঝুঁকে এসে বলল, 'টাকাটা তোকে যে শুধু শুধু দিয়ে দিয়েছি তা না। এর বদলে তোকে একটা কাজ করতে হবে।'

'কি কাজ?'

'আমার যেন কিছু ব্যবস্থা হয় সেই দোয়া করবি। সত্যবাদী মহিলার দোয়া আল্লাহ শুনবেন।'

'আচ্ছা যাও, দোয়া করব।'

'আল্লাহকে বলবি এই যে খ্রীষ্টান হচ্ছি এটা আমার একটা ট্রিকস। উনি যেন এটাকে আবার সিরিয়াসলি না নেন।'

লিলি হাসছে। শব্দ করে হাসছে।

জাহেদুর রহমান উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'গুড গার্ল। চল, নাশতা খেয়ে আসি।'

নাশতার টেবিলে দারুণ হৈ চৈ হচ্ছে। নেয়ামত সাহেব ভাজির বাটি মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে ভেঙেছেন। এখন বিকট চিৎকার করছেন। ঐ বেটির মুখে এক খোরা লবণ ঢুকিয়ে দাও। তাহলে যদি শিক্ষা হয়।

মতির মা ভাঙা বাটির টুকরা কুড়াচ্ছে। ফরিদা নতুন করে ভাজি বসিয়েছেন।

লিলি রান্না ঘরে মা'র পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ফিস ফিস করে বলল, 'বাবা এরকম বিশ্রী করে চেঁচাচ্ছে কেন মা?'

ফরিদা বললেন, 'পুরুষ মানুষ একটু চেঁচামেচি তো করবেই। পুরুষদের সব কিছু ধরতে নেই। লবণটা একটু দেখতো মা। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ভয়ের চোটে দু'বার লবণ দিয়ে ফেলেছি।'

লিলি সামান্য ভাজি মুখে নিয়ে বলল, 'দু'বার না মা, তুমি তিনবার লবণ দিয়েছ।' বলতে বলতে লিলি হাসল। লিলির হাসি দেখে ফরিদা হাসলেন। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বিস্মিত গলায় বললেন- 'তুই তো দারুণ সুন্দর হয়েছিস লিলি। কি আশ্চর্য কাণ্ড, আমি তো লক্ষ্যই করিনি। তুই কি সকালে গোসল করেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'তোর বয়েসী মেয়েদের সবচে সুন্দর দেখা যায় গোসলের পর পর। এত সকালে গোসল

করলি কেন?'

'জানি না কেন। আচ্ছা মা শোন, আজ আমার কোথাও বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে।'

'কোথায়?'

'বিশেষ কোথাও না, এই ধর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলাম। নিউ মার্কেটের দোকানগুলি দেখলাম।'

'যাই করিস তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করে করবি।'

'সমস্যা তো এইখানেই।'

রুমু রান্নাঘরে ঢুকল। তার হাতে একটা খাম। সে লিলির হাতে দিয়ে যে ভাবে চুপিচুপি এসেছিল সেই ভাবেই বের হয়ে গেল। ফরিদা বললেন, 'কার চিঠি?'

'স্বাতীর চিঠি।'

'যাক, বাঁচা গেল। আমি ভাবলাম রুমু ঝুমুর মাস্টার বুঝি প্রেমপত্র লিখে ফেলেছে। ওর তাকানো ভাল না। শকুনের মত কেমন করে যেন তাকায়। স্বাতী হঠাৎ চিঠি লিখল কেন?'

'আজ ওর জন্মদিন। যেতে বলেছে। মা, যাব?'

'তোর বাবাকে জিজ্ঞেস কর।'

'বাবা যেতে দেবে না।'

'দিতেও পারে। তোকে পছন্দ করে। নরম গলায়, কাঁদোকাঁদো হয়ে বলে দেখ।'

'এখন বলব?'

'না, এখন না। খবরের কাগজটা আসুক। খবরের কাগজ হাতে পড়লে মেজাজ একটু ভাল থাকে। তখন এক কাপ চা নিয়ে যাবি তারপর বলবি।'

নেয়ামত সাহেব খবরের কাগজ পড়ছেন। তাঁর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। সামনে অ্যাসট্রে আছে। ছাই অ্যাসট্রেতে ফেলছেন না- চারপাশে ফেলছেন। লিলি চায়ের কাপ তাঁর সামনে রাখতে রাখতে বলল, 'বাবা আমার এক বান্ধবী যে আছে স্বাতী, আজ ওর জন্মদিন।'

নেয়ামত সাহেব চোখ তুলে তাকালেন। লিলি বলল, 'আমাকে খুব করে যেতে লিখেছে। এক ঘন্টার জন্যে।'

'তোর বান্ধবীর জন্মদিন?'

'জ্বি।'

'বুড়ো ধাড়ি মেয়ের আবার জন্মদিন কি? এইসব আমার পছন্দ না। ছুটির দিন বাসায় থাকবি। বাইরে বাইরে ঘুরবি কেন? যা, মাকে সাহায্য কর। একা মানুষ চারদিক সামলাচ্ছে, তাকে দেখে একটু মায়াও হয় না?'

নেয়ামত সাহেব আবার কাগজ পড়তে শুরু করলেন। লিলি চায়ের কাপ নামিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

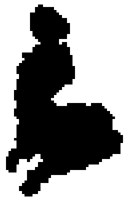

……

স্বাতী ভেবে রেখেছিল সে তার জন্মদিনে লিলিকে ব্যাপারটা বলবে। ভয়ংকর অন্যায় যে সে করেছে সেই ব্যাপারটা। লিলি আতংকে শাদা হয়ে যাবে। পর পর কয়েকবার বলবে, এখন কি হবে রে? এখন কি হবে? তখন স্বাতী তার পরিকল্পনার কথা বলবে। সেটা শুনে লিলি আরো আতংকগ্রস্ত হবে।

নিজের আতংক অন্যের ভেতর দেখলে নিজের আতংক খানিকটা কমে। স্বাতী খানিকটা স্বস্তি পাবে। এবং কিছুটা সাহসও পাবে। সেই সাহসটা পাবার পর স্বাতী ব্যাপারটা তার মা'কে বলতে পারবে। মা'কে কিভাবে বলবে তা সে ঠিক করে রেখেছে। ভয়ংকর অন্যায়ের ব্যাপারটা মা'কে বলা হবে সবার শেষে। চেষ্টা করবে ভয়ংকর ব্যাপারটা না বলতে। তবে তিনি জানতে চাইলে বলতেই হবে।

সে শুরু করবে এই ভাবে- রাতে ঘুমুতে যাবার আগে মা'র ঘরে গিয়ে বলবে, মা, আজ জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমি তোমার সঙ্গে তোমার ঘরে ঘুমুব। বাবাকে গেষ্ট রুমে ঘুমুতে বল।

মা সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়ে বলবে- ঠিক আছে, ঘুমুবি।

সে বলবে ছোট বেলায় যেভাবে ঘুমুতাম ঠিক সেই ভাবে ঘুমুব। তুমি তোমার চুল খোলা রেখে শুয়ে থাকবে। আমি তোমার চুল শরীরে ফেলে ঘুমুব।

মা আরও খুশি হবে। হাসি মুখে বলবে, 'সেই লম্বা চুল কি আছে রে মা।'

স্বাতীর ছোটবেলায় ঘুমের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। মায়ের চুল তার সারা শরীরে ছড়িয়ে দিতে হত। এই ঘুমের বিশেষ একটা নাম ছিল- "চুল ঘুম"। মায়ের চুল ভেজা হলে এই "চুল ঘুম" দেয়া যেত না। স্বাতী কান্নাকাটি করে বাড়ি মাথায় তুলতো।

অনেকদিন পর "চুল ঘুমের" ব্যবস্থা করে স্বাতী বলবে- মা শোন, আমি যদি পছন্দের কোন ছেলেকে বিয়ে করি তাহলে তুমি কি আপত্তি করবে?

মা সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক চমকে উঠে বলবে, 'ছেলেটা কে?'

স্বাতী বলল, ছেলেটা কে সেই প্রশ্ন পরে আসছে। আগে বল, আমার নিজের পছন্দের কাউকে বিয়ে করতে দিতে তোমার আপত্তি আছে কি-না।

মা নিতান্ত অনিচ্ছায় প্রায় ফিস ফিস করে বলবেন- না।

তখন স্বাতী বলবে, 'ভাল ছেলে বলতেই বাবা-মা'র চোখে যে ছবি ভাসে ঐ ছেলে সে রকম না।

'কি করে সে?'

'সে একজন কবি।'

'কি সর্বনাশ।'

'কি সর্বনাশ বলে লাফ দিয়ে ওঠার কিছু নেই মা। কবিরা ভয়ংকর কোন প্রাণী না।'

'করে কি?'

'বললাম না, কবি। কবিতা লেখে। আর করবে কি?'

'সংসার চালায় কিভাবে? কবিতা লিখে কি সংসার চলে?'

'সেটা একটা কথা। কবিতা লিখে সংসার চলে না। তবে সে কবিতা ছাড়া আর কিছু লিখতেও পারে না।'

'আমার মনে হচ্ছে তুই মিথ্যা কথা বলছিস। তুই ঠিকঠাক করে বল ছেলে করে কি?'

'মা, ও একজন পেইন্টার।'

'পেইন্টার মানে কি? গাড়িতে যে রঙ করে সেও তো পেইন্টার।'

'ও গাড়িতে রঙ করে না মা। কাগজে ছবি আঁকে। অপূর্ব ছবি। দেখলে তোমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। দেখতেও খুব হ্যান্ডসাম। শুধু বয়স সামান্য বেশি।'

'সামান্য বেশি মানে কত বেশি?'

'কত বেশি তা তো বলতে পারব না। জিজ্ঞেস করিনি কখনো। কপালের কাছের কিছু চুল পাকা দেখে মনে হয় বয়স হয়েছে। মধ্যবয়স্ক।'

'পরিচয় হল কিভাবে?'

'খুব ইন্টারেস্টিং ভাবে পরিচয় হয়েছে। আমি বৃটিশ কাউন্সিল থেকে একটা বই এনেছিলাম। আমার কাছ থেকে সেই বই নিয়ে গেল যূথী। আর তো বই ফেরত দেয় না, শুধু ফাইন হচ্ছে। শেষে একদিন করলাম কি অফিস থেকে যূথীর ঠিকানা নিলাম। বাসা খুঁজে বের করব। যূথী থাকে ভূতের গলিতে– কলাবাগান হয়ে যেতে হয়। আমি একে ওকে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছি– এইভাবে ভদ্রলোকের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। খুব সুন্দর একটা বাড়ি। ছায়া ছায়া বাড়ি। শহরের মাঝখানে যেন ছোট্ট একটা বাঁশবনওয়ালা গ্রাম। বাড়ির সামনে জঙ্গল মত হয়ে আছে। সেই জঙ্গলে ফুটফুটে একটা মেয়ে একা একা খেলছে। মেয়েটাকে দেখে এমন মজা লাগল। আমি বললাম, 'এই খুকি, এটা কার বাড়ি?'

মেয়েটা বলল, 'আমাদের বাড়ি।'

'নাম্বার কত বাড়ির?'

'আমি তো জানি না নাম্বার কত।'

'জান না কেন? তোমার এখন কঠিন শাস্তি হবে। আমি হচ্ছি বাড়ির ইন্সপেক্টর।

আমি যে মজা করছি মেয়েটা চট করে বুঝে ফেলল। সে হাসিমুখে বলল, 'ভেতরে আসুন, আন্টি।'

বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে আমার তখন পানির পিপাসা পেয়ে গিয়েছিল। কোন বাড়িতে ঢুকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খেতে পারলে ভালই হয়। আমি বললাম, 'তোমাদের বাড়িতে কি ফ্রীজ আছে?'

'আছে।'

'সেই ফ্রীজে পানির বোতল আছে?'

'হ্যাঁ।'

'সেই পানির বোতলে পানি আছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে পানি খাওয়ার জন্যে যাওয়া যায়। তোমাদের বাড়িতে তুমি ছাড়া আর কে আছে?'

'বাবা আছে।'

'মা কোথায় গেল?'

'মা মারা গেছেন। আমার জন্মের সময় মারা গেছেন।'

আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কি ফুটফুটে একটা মেয়ে। মায়ের আদর কি জানে না। আমি বললাম, তাহলে এই সুন্দর বাড়িটাতে শুধু তুমি আর তোমার বাবা থাক?

'বুয়া ছিল। গত বুধবার বুয়া করেছে কি, বাবার মানিব্যাগ আর আমার পানির বোতলটা নিয়ে পালিয়ে গেছে।'

'বল কি এখন রান্না করছে কে?'

'বাবা আর আমি আমরা দু'জনে মিলে রান্না করছি।'

'সেটা তো ভালই।'

'আসুন আন্টি। ভেতরে আসুন।'

'তোমার বাবা আবার রাগ করবেন না তো?'

'বাবা রাগ করবে না। বাবা ছবি আঁকছে। বাবা কিছু বুঝতেই পারবে না।'

আমি বাড়িতে ঢুকলাম। পানি খেলাম। জাহিন আমাকে তার বাবার স্টুডিওতে নিয়ে গেল। ভদ্রলোক ছবি আঁকছিলেন। কি ছবি জান মা, বিরাট সর্ষে ক্ষেতের মাঝখানে বাচ্চা একটা মেয়ে। পুরো হলুদ হয়ে আছে। সেই হলুদ মাঠে লাল ডুরে শাড়ি পরা বাচ্চা মেয়েটা কে জান? ওনার মেয়ে জাহিন। কি সুন্দর করে যে উনি ছবিটা এঁকেছেন।

'তুই পছন্দ করেছিস বিপত্নীক একটা মানুষ?'

'হ্যাঁ।'

স্বাতীর মা এই পর্যায়ে বিছানা থেকে উঠে বসবেন। হতভম্ব হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। স্বাতী বলবে– তুমি এরকম করে তাকিয়ে আছ কেন? বিপত্নীক মানুষকে পছন্দ করা যাবে না বাংলাদেশের সংবিধানে এমন নিয়ম নেই।

স্বাতীর মা থমথমে গলায় বলবেন, 'তুই ঐ মানুষটাকে বিয়ে করবি?'

'হুঁ।'

মা চোখে পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকবেন। তখন স্বাতী নিচু গলায় বলবে, 'বিয়ে না করে আমার উপায় নেই মা। আমি ভয়ানক একটা অন্যায় করে ফেলেছি।'

লিলি আসেনি।

কাজেই স্বাতীর পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে গেল। মেজাজও খারাপ হতে লাগল। সারাদিন মানুষ আসছে, খুশী, খুকু, মামারা। ফুল আসছে। টেলিফোন আসছে। এবং সবাইকে নাজমুল সাহেব সন্ধ্যার পর আসতে বলছেন। হোটেল সোনারগাঁয়ে কেকের অর্ডার দেয়া হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা কেক কাটা হবে। সন্ধ্যার আগে আগে স্বাতী বলল– মা আমি একটু ঘুরে আসি?

রওশন আরা অবাক হয়ে বললেন, 'এখন কোথায় যাবি? সন্ধ্যাবেলা সবাই আসবে।'

'সন্ধ্যার আগে আগে চলে আসব মা।'

'তাহলে গাড়ি নিয়ে যা।'

গাড়ি লাগবে না।

কলিং বেলে হাত রাখার আগেই জাহিনের তীব্র ও তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল– আন্টি আন্টি আন্টি।

স্বাতী বলল, 'চেঁচাবি না। চেঁচিয়ে মাথা ধরিয়ে ফেলেছিস। বাবা আছে?'

'হুঁ।'

'কি করছে?'

'ছবি আঁকছে।'

'কিসের ছবি?'

'একটা বুড়ো লোকের ছবি।'

'ছবি আঁকার জিনিস পাচ্ছে না, বুড়ো লোকের ছবি আঁকতে হবে?'

'বুড়ো লোকটা ছাতা মাথায় বৃষ্টির মধ্যে হাঁটছে।'

'সুন্দর একটা মেয়ের ছবি আঁকবে যে বৃষ্টির ভেতর হাঁটবে– তা না...'

'আন্টি, আজ তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে গল্প করবে, বাবার সঙ্গে না। এর আগের দু'বার যে এসেছিলে আমার সঙ্গে কোন গল্প করনি।'

'তোর সঙ্গে কি গল্প করব। তুই তো কোন গল্পই জানিস না।'

জাহিনের একটু মন খারাপ হল, কারণ সে আসলেই কোন গল্প জানে না। স্বাতী বলল, যারা দিনরাত গল্পের বই পড়ে তারা কোন গল্প বলতে পারে না। যারা খুব জমিয়ে গল্প করে, খোঁজ নিয়ে দেখবি তারা কোন গল্পই জানে না।

'আন্টি, তুমি কি আমার জন্যে কিছু এনেছ?'

'হুঁ।'

'কি এনেছ?'

'এখন বলব না। এখন আমি চা খাব।'

'আমিও তোমার সঙ্গে চা খাব।'

'তৈরী হও, চল রান্নাঘরে যাই।'

'আন্টি, তুমি কি গান জান?'

'গান জানি না। নাচ জানি।'

'নাচ জান? সত্যি?'

'সত্যি। ছোট বেলায় আমার নাম কি ছিল জানিস? লিটল ড্যান্সার। ছোট নর্তকী।'

'সবাই তোমাকে ছোট নর্তকী ডাকত?'

'সবাই ডাকত না। শুধু বাবা ডাকত– এখনো ডাকে।'

'স্কুলে আমাকে কি ডাকে জান?'

'না।'

'স্কুলে আমাকে ডাকে চার চোখ। চশমা পরি তো এই জন্যে চার চোখ। স্কুলে আমাদের আরেকটা মেয়ে আছে তার নাম– কাঁচা মরিচ। স্কুলে তোমাকে কি ডাকত আন্টি?'

'স্কুলে আমার নাম ছিল 'মিস গুণ্ডি'। সবার সঙ্গে গুণ্ডামী করতাম এই জন্যে মিস গুণ্ডি নাম। শোন জাহিন, তোর সঙ্গে বক বক করে আমার মাথা ধরে গেছে। তুই আর কোন কথা বলতে পারবি না। আমি চা বানাব তুই চুপচাপ পাশে দাঁড়িয়ে থাকবি।'

'ইশারায় কি কথা বলতে পারব?'

'হ্যাঁ, ইশারায় বলতে পারবি।'

স্বাতী চা বানাচ্ছে। তিন কাপ চা হচ্ছে। তার জন্যে, জাহিনের জন্যে এবং জাহিনের বাবার জন্যে। জাহিন বেচারী আসলেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। একবার শুধু ইশারায় বলেছে তাকে চিনি বেশি দিতে হবে। স্বাতীর মায়া লাগছে। সে বলল, আচ্ছা যা, তোকে আর তিন মিনিট কথা বলার সুযোগ দেয়া গেল।

জাহিন সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আন্টি, তোমার সঙ্গে কি বাবার বিয়ে হচ্ছে?'

স্বাতী থতমত খেয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, হুঁ। 'তুই বুঝলি কি করে?'

'বাবা বলেছে।'

'কখন বলল?'

'পরশুদিন রাতে।'

'কথাটা কিভাবে বলল?'

'বাবা বলল, তোর স্বাতী আন্টি মেয়েটা কেমনরে? আমি বললাম, খুব ভাল। তখন বাবা বলল, এই মেয়েটাকে আমাদের বাসায় রেখে দিলে কেমন হয়? আমি বললাম, খুব ভাল হয়। কিভাবে রাখবে? বাবা বলল, একদিন যখন বাসায় আসবে তখন দরজা জানালা বন্ধ করে তাকে আটকে ফেলব, আর যেতে দেব না। তখন আমি বুঝলাম বাবা তোমাকে বিয়ে করবে। বিয়ের কথা বলতে লজ্জা লাগছে তো– এই জন্যে ঘুরিয়ে বলছে। আমার বুদ্ধি বেশি তো এই জন্যে ধরে ফেলেছি।'

'বুদ্ধিমান কন্যা, এই নিন আপনার চা।'

'থ্যাংক য়্যু আন্টি।'

'আর এই নিন আপনার উপহার।'

স্বাতী তার কাঁধে ঝুলানো ব্যাগ থেকে গল্পের বই বের করল। একটা না, কয়েকটা। জাহিনের চোখ চকচক করছে। মনে হচ্ছে সে কেঁদে ফেলবে। স্বাতী বলল, উপহার আরো আছে, এক প্যাকেট চকলেট আছে। এই চকলেটের নাম কি জানিস?

'না।'

'এর নাম 'সুইস গোল্ডবার' আমার খুব প্রিয় চকলেট। এখন তুই বই নিয়ে পড়তে বোস। এক পাতা পড়বি, চকলেটে একটা কামড় দিবি।'

'তুমি কি বাবার সঙ্গে গল্প করবে?'

'হ্যাঁ।'

'আজ তোমাকে দেখতে এত খারাপ লাগছে কেন?'

'আজ আমার মনটা খারাপ। মন ভাল করার জন্যে তোদের কাছে এসেছি।'

'মন ভাল হয়েছে?'

'এখনো হয়নি।'

'বাবার কাছে গেলে মন আরো খারাপ হবে।'

'কেন?'

'বাবা খুব রেগে আছে। তার ছবি ভাল হচ্ছে না– এই জন্যে রেগে আছে। আমার সঙ্গেও গম্ভীর হয়ে কথা বলেছে।'

'সেটা অবশ্যি একদিক দিয়ে ভাল। দু'জন মন খারাপ লোক পাশাপাশি থাকলে "মন খারাপ" ব্যাপারটা চলে যায়।'

বাতী দু'কাপ চা নিয়ে স্টুডিওতে ঢুকল। স্টুডিও অন্ধকার। জানালা বন্ধ। ঘরে কোন আলো নেই। ঘরের ভেতরে সিগারেটের ধোঁয়া। কুয়াশার মত জমে আছে। বাতী বলল, 'তুমি কোথায়?'

কোন জবাব পাওয়া গেল না। বাতী বলল, 'চা এনেছি।'

ঘরের এক কোণ থেকে ক্লান্ত গলায় হাসনাত কথা বলল, 'এদিকে এসো।'

হাসনাত শুয়ে আছে ক্যাম্প খাটে। এই গরমেও তার গায়ে চাদর। বাতী বলল, 'তোমার কি হয়েছে?'

'প্রচণ্ড মন খারাপ।'

'কেন?'

'তিন মাস ধরে একটা কাজ করলাম। দিনরাত কাজ করেছি। কাজটা নষ্ট হয়ে গেছে।'

'নষ্ট হল কিভাবে?'

'কাজে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়নি। ছবি আঁকা হয়েছে। ছবিতে প্রাণ নেই।'

'প্রাণ নেই কেন?'

'সেটা জানি না। জানতে পারলে তো কাজই হত। তুমি দূরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কাছে এসো।'

বাতী ক্ষীণস্বরে বলল, 'আজ আমার জন্মদিন।'

'আমার কাছ থেকে কি উপহার চাও?'

'এখনো বুঝতে পারছি না। সুন্দর একটা ছবি এঁকে দিতে পার, যে ছবিতে প্রাণ আছে।'

'প্রাণের ব্যাপারটা বাইরে থেকে আসে। আমি ইচ্ছা করলেই প্রাণ দিতে পারি না। তুমি কাছে আসছ না কেন? তোমার ভেতর কি এখনো কোন দ্বিধা আছে?'

বাতী চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে সে এগুচ্ছে। ভয়ংকর একটা অন্যায় করতে যাচ্ছে। তার পেছনে ফেরার পথ নেই।

……

বাতী ফিসফিস করে বলল, এই, গায়ে হাত দিয়ে দেখ তো আমার জ্বর কি না। বাতীর মত উদ্ভট কথা। জহিরুল হক স্যারের ক্লাস চলছে। মাছিদের যেমন এক লক্ষ চোখ, স্যারেরও তেমনি। স্যারের মনে হয় দু'লক্ষ চোখ। কোথায় কি হচ্ছে সবই তিনি দেখেন। শুধু দেখেই ক্ষান্ত হন না। ক্যাটক্যাট করে কথা বলেন। লিলি জ্বর দেখতে যাবে আর স্যার দারুণ অপমানসূচক কোন কথা বলবেন না, তা কখনো হবে না। গত সপ্তাহে দুলালী তাঁর ক্লাসে হাই তুলছিল। তিনি দুলালীর দিকে তাকিয়ে বললেন– এই মেয়ে, হাই তোলার সময় মুখের সামনে বই–খাতা কিছু ধরবে। তুমি যে রকম বড় করে হাই তোল– মুখের ভেতর দিয়ে একেবারে পাকস্থলী পর্যন্ত দেখা যায়।

ক্লাসের সব ছেলেমেয়ে হো হো করে হেসে উঠল। হাসিতে ব্যাপারটা ইতি হলে কথা ছিল– ইতি হয়নি। কয়েকটা ছেলে দুলালীকে 'মিস পাকস্থলী' ডাকা শুরু করেছে। যতবার ডাকছে ততবারই দুলালীর চোখে পানি এসে যাচ্ছে। কাজেই ছেলেরা এই ডাক সহজে ছাড়বে না। ইউনিভার্সিটিতে দুলালীকে আরো তিন বছর থাকতে হবে। এই তিন বছরে তার মিস পাকস্থলী নাম স্থায়ী হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কি ভয়াবহ সম্ভাবনা!

বাতী আবারও বলল, 'এই লিলি, দেখ না আমার জ্বর আসছে কি না।'

লিলি ফিসফিস করে বলল, 'এখন পারব না। ক্লাস শেষ হোক। তখন দেখব।'

বাতী বলল, 'ক্লাস শেষ হতে হতে আমার জ্বর কমে যেতে পারে, এখনি দেখ। নাউ অর নেভার।'

আর তখনি জহিরুল হক স্যার পড়া বন্ধ করে গম্ভীর গলায় বললেন 'এই যে টু 'উইমেন, দু'জনই উঠে দাঁড়াও।'

লিলির বুক ধড়ফড় করছে। স্যার কি বলেন কে জানে। ছাত্ররা সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। স্যারের কাউকে দাঁড় করানো মানে মজাদার কিছু সময়। বিড়াল যেমন ইঁদুর মারার আগে ইঁদুর নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করে, তিনিও করেন। সেই খেলা দেখতে ভাল লাগে। লিলির চোখ–মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলেও বাতী বেশ স্বাভাবিক। সে দাঁড়িয়েছে হাসি হাসি মুখে।

স্যার বললেন, 'তোমরা কি নিয়ে গল্প করছিলে?'

লিলির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করা হলেও জবাব দিল বাতী। সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল,

'স্যার, আমরা গল্প করছিলাম না। আমি লিলিকে বলছিলাম আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখতে জ্বর আসছে কি না। ও রাজি হচ্ছিল না।'

'ও টা কে?'

'ও হচ্ছে লিলি, রোল থার্টি টু।'

সবাই হেসে উঠল। জহিরুল হক স্যারের মুখ আরও গম্ভীর হয়ে গেল। যে রসিকতা তাঁর করার কথা সেই রসিকতা অন্য একজন করছে, এটা হজম করা তাঁর পক্ষে মুশকিল।

'তোমার কি জ্বর না-কি?'

'বুঝতে পারছি না স্যার। রোল থার্টি টুকে বললাম দেখে দিতে। ও দেখল না।'

স্বাতী করুণ ভঙ্গি করে কথা শেষ করল। সবাই আবারও হেসে উঠল। জহিরুল হক স্যারের মুখ রাগে ছাই বর্ণ হয়ে গেল। তিনি অনুভব করলেন কন্ট্রোল এই মুহূর্তে তাঁর হাতে নেই- পরিস্থিতি দ্রুত সামলে নিতে না পারলে ভবিষ্যতে এই মেয়ে ক্লাসে অনেক যন্ত্রণা করবে। তিনি লিলির দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন- 'এই মেয়ে, দেখ, তোমার বান্ধবীর জ্বর দেখ। কপালে হাত দিয়ে দেখ ভাল মত।'

লিলি দারুণ অস্বস্তি নিয়ে স্বাতীর কপালে হাত দিল।

'কি, জ্বর আছে?'

'জি, স্যার।'

'বেশি না কম?'

'মোটামুটি।'

'জ্বর নিয়ে ক্লাস করতে হবে না। যাও, চলে যাও।'

ক্লাস থেকে স্বাতী বই-খাতা গুটিয়ে হাতে নিল। সে বেশ হাসিমুখে বের হচ্ছে। জহিরুল হক স্যার লিলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? তুমিও যাও। অসুস্থ বান্ধবীকে একা ছেড়ে দেবে, তা কি করে হয়!'

স্বাতীর পেছনে লিলিকেও বের হতে হল। স্বাতীর উপর রাগে লিলির গা জ্বলে যাচ্ছে। কি ভয়ানক অবস্থার মধ্যে স্বাতী তাকে ফেলে দিল! ওর সঙ্গে চলাফেরা করা মুশকিল হয়ে উঠেছে।

স্বাতী বলল, 'যাক, অল্পের উপর দিয়ে পার পাওয়া গেল। এখন কি করা যায় বল দেখি? সামথিং হ্যাজ টু বি ডান। কিছু একটা তো করা দরকার।'

লিলি জবাব দিল না। তাদের পরের ক্লাস বিকাল তিনটায়। মাঝখানের আড়াই ঘন্টা কিছুই করার নেই। স্বাতী বলল, 'আমার সঙ্গে চল এক জায়গায়।'

'আমি তোর সঙ্গে কোথাও যাব না।'

'দারুণ একটা জায়গায় নিয়ে যাব।'

'বেহেশতে নিয়ে গেলেও যাব না।'

'এই আড়াই ঘন্টা করবি কি?'

'যা-ই করি, তোর সঙ্গে যাব না।'

'আমি জ্বরে মরে যাচ্ছি আর তুই আমাকে পরিত্যাগ করছিস। এটা কি ঠিক হচ্ছে? আমার যে জ্বর সেটা তো মিথ্যা না।'

'জ্বর নিয়ে ঘোরাঘুরিই-বা দরকার কি? বাসায় চলে যা।'

স্বাতী নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বাসাতেই যাব। জ্বর মনে হয় আরও বাড়বে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা

লাগছে। তুই আমাকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দে। না-কি তাও করবি না? বাসায় গিয়ে দু'টা প্যারাসিটামল খেয়ে শুয়ে থাকব। তুই মা'র সঙ্গে গল্প করবি। ঘন্টাখানেক রেস্ট নেওয়ার পর আমার যদি শরীরটা ভাল লাগে তাহলে লাস্ট ক্লাসটা করব। কি, রাজি?'

লিলি রাজি হল। রিকশায় বসে হুড তুলতে তুলতে স্বাতী বলল, 'পথে আমি এক জায়গায় জাস্ট এক মিনিটের জন্য থামব। একজনের সঙ্গে দেখা করে দু'টা কথা বলেই চলে আসব। তুই আমার সঙ্গে যেতে না চাইলে রিকশায় বসে থাকিস।'

রিকশায় বসে থাকার ব্যাপারটা হচ্ছে কথার কথা। লিলি খুব ভাল করেই জানে তাকেও নামতে হবে। স্বাতীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন ব্যাপার। তার মনে যা আসে তা করবেই। লিলির ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছে- আজকের পুরো ব্যাপারটাই স্বাতীর সাজান। হয়ত সে এক সপ্তাহ আগেই ঠিক করেছে- আজ জহিরুল হক স্যারের ক্লাসে একটা নাটক করে লিলিকে নিয়ে বের হয়ে আসবে... হয়ত...

স্বাতী বলল, 'এ রকম মুখ ভোঁতা করে বসে আছিস কেন?'

'ভাল লাগছে না।'

'পৃথিবীতে কোন বাক্যটি সবচে' বেশি ব্যবহৃত হয় জানিস লিলি? সবচে' বেশি ব্যবহৃত বাক্য হচ্ছে- "ভাল লাগছে না"। ভাল লাগছে এ রকম কথা আমরা প্রায় বলিই না।'

'ভাল লাগার মত কিছু ঘটে না, তাই বলি না।'

'ভাল লাগার মত অনেক কিছুই ঘটে। তারপরও আমরা বলি না- এই যে আজ জহিরুল হক স্যারকে কোণঠাসা করে ফেললাম- তোর খুব ভাল লাগছিল- কিন্তু তুই কি বলেছিস ভাল লাগছে?'

লিলি চুপ করে রইল। স্বাতী উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'আজ তিনটার ক্লাসটা যে আমরা করব না এটা ভেবেও তোর ভাল লাগছে। কিন্তু মুখ ফুটে তুই তা বলবি না।'

'তিনটার ক্লাস করছি না?'

'না।'

'তুই না করলে না করবি। মরে গেলেও আমি ক্লাস মিস দেব না।'

স্বাতী হাসিমুখে বলল, 'তোর সঙ্গে একশ টাকা বাজি, তুই আজকের ক্লাস মিস করবি। আমি তোকে আটকে রাখব না কিছু করব না। তুই নিজ থেকেই বলবি- আজকের ক্লাস করব না। রাজি?'

'আমি তোর কথাবার্তা কিছু বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছিস না কেন? আমি কখনো জটিল কথা বলি না। সহজ কথা বলি। যারা মানুষ হিসেবে খুব জটিল তারা খুব সহজ জীবনযাপন করে, খুব সহজ কথা বলে। আমি খুব জটিল মেয়ে, এই জন্যেই আমার জীবনযাত্রা সহজ।'

লিলি বলল, 'তোর ধারণা তুই জটিল মেয়ে, আসলে জটিল না। তুই সহজ ধরনের মেয়ে।'

'তোকে যে বাসায় নিয়ে যাচ্ছি সে বাসায় পা দেয়া মাত্র তুই বুঝবি, আমি জটিল মেয়ে। সে বাসায় একজন ভদ্রলোক থাকেন। বুড়ো বুড়ো টাইপের একটা লোক। বেঁটে-খাট গাট্টাগোট্টা ধরনের। যার কোন ফিক্সড ইনকাম নেই- দিনে আনি, দিনে খাই টাইপ মানুষ। বিপত্নীক। একটা মেয়ে আছে সে ক্লাস ফোর কিংবা ফাইভে পড়ে। মেয়ে অবশ্যি বাবার সঙ্গে

থাকে না, নানার বাড়িতে থাকে। মাঝে মধ্যে বাবার কাছে আসে।'

লিলি বিরক্ত গলায় বলল, 'ঐ ভদ্রলোকের বাসায় তুই আমাকে নিয়ে যাবি এবং সে কারণেই তুই জটিল মেয়ে?'

'না- আমি জটিল মেয়ে, কারণ ঐ ভদ্রলোককে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। মোটেই ঠাট্টা করছি না। সত্যি কথা বলছি। ক্রস মাই হার্ট।'

লিলি তাকিয়ে রইল। স্বাতী যে সত্যি কথা বলছে এটা সে ধরতে পারছে। স্বাতী ঠোঁট সরু করে কাম সেপ্টেম্বরের মিউজিক আনার চেষ্টা করছে। আসছে না। সে শিস বন্ধ করে গম্ভীর গলায় বলল- 'বিয়ে কোথায় হবে, কিভাবে হবে সেটা উনি ঠিক করবেন। আজ আমাকে তা জানানোর কথা। দুপুরে ওখানে আমার খাবার দাওয়াত। তুই ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে থাকতে পারিস, ইচ্ছা করলে আমাকে নামিয়ে দিয়ে তিনটার ক্লাস করতে পারিস।'

'ভদ্রলোক কি করেন?'

'বললাম না দিনে আনে দিনে খায়।'

'তার মানে কি?'

স্বাতী হাসতে লাগল। হাসতে হাসতেই বলল, 'জ্বরটা আরও বেড়েছে না-কি দেখ তো। মনে হয় টেনশানের জ্বর। যত টেনশান হচ্ছে তত জ্বর বাড়ছে।'

লিলি জ্বর দেখল না। তার হতভম্ব ভাব কাটছে না। কেমন ভয় ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে স্বাতী ভয়ংকর কোন বিপদে পড়েছে, অথচ সে তা বুঝতে পারছে না। স্বাতী যদি জেনে শুনে কোন বিপদে পড়ে, সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা লিলির নেই। স্বাতীকে ফেলে রেখে চলে যাবার ক্ষমতাও লিলির নেই।

কলাবাগানের এক গলির সামনে স্বাতী রিকশা থামাল। ভাড়া মিটাল। লিলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই ইচ্ছা করলে এই রিকশা নিয়েও চলে যেতে পারিস। চলে যাবি?'

'না।'

'জানতাম যাবি না। এরকম ভূতে-পাওয়া চেহারা করে আছিস কেন? সহজ হ লিলি। বিয়ে তো তোর হচ্ছে না। আমার হচ্ছে।'

তারা গেট খুলে একতলা একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বাড়িটা শ্যাওলা ধরা, উঁচু দেয়ালে ঘেরা। দেয়ালের ভেতরে গাছপালা জঙ্গল হয়ে আছে। ঘাস হয়েছে হাঁটু-উঁচু। তবে বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম। সামনে প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দা তারের জালি দিয়ে ঘেরা। লিলি বলল, 'বাড়িতে জনমানুষ নেই বলে মনে হচ্ছে। কত বড় তালা ঝুলছে দেখছিস?'

স্বাতী বলল, 'এসে পড়বে। ও জানে আমি একটার সময় আসব। একটা এখনও বাজেনি। একটা বাজতে এখনও পনেরো মিনিট।'

'এতক্ষণ আমরা কি করব? বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকব?'

'দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, আমার কাছে চাবি আছে।'

স্বাতী হ্যান্ডব্যাগ থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে বলল- 'আয়, ভেতরে আয়। লিলির বিস্ময়ের সীমা রইল না। চাবি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে। কত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তালা খুলেছে, যেন এটা তার নিজের ঘরবাড়ি। কতদিন থেকে সে স্বাতীকে চেনে। কিন্তু যাকে সে চেনে এই মেয়ে কি সেই মেয়ে!

'লিলি, এটা হচ্ছে ওর বসার ঘর। এখানে বসবি, না ভেতরের বারান্দায় বসবি? ভেতরের

বারান্দাটা খুব সুন্দর।'

লিলি জবাব দিল না। তার ঘোর এখনো কাটছে না। স্বাতী বলল, 'আয় ভেতরের বারান্দায় গিয়ে বসি। না-কি চলে যাবি?'

'চলে যাব।'

'সত্যি চলে যাবি?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা যা। তুই এত ভড়কে গেছিস কেন বুঝলাম না। যাই হোক, তোর নার্ভাস ভাব দেখে আমার নিজেরই খারাপ লাগছে। পনেরো মিনিট বসে যা না। ও আসুক, ওকে দেখে চলে যাবি।'

'আমি এখনই যাব।'

'যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি তাকে চোখের দেখাও দেখবি না?'

'আমার কাউকে দেখতে ইচ্ছা করছে না।'

'আচ্ছা, তাহলে যা। ধর এই নোটটা নে। তোর সঙ্গে একশ' টাকা বাজি ছিল।'

'কিসের বাজি?'

'এর মধ্যে ভুলে গেলি? বাজি ছিল না- তুই তিনটার ক্লাস করলে তোকে একশ টাকা দেব। তুই ক্লাস করতে যাচ্ছিস। ইউ আর দ্যা উইনার।'

'আমি ক্লাস করব না। বাসায় চলে যাব।'

'তাহলে তুই আমাকে একশ টাকা দিয়ে যাবি। বাজি মানে বাজি...।'

স্বাতীর কথা শেষ হবার আগেই দরজার কড়া নড়ল। সামান্য কড়া নাড়ার শব্দ, অথচ লিলির মনে হচ্ছে তার বুকে কেউ হাতুড়ি পেটাচ্ছে। স্বাতী বলল, 'যাক, ও এসে পড়েছে। তুই চলে গেলে একা বাড়িতে আমার ভয় ভয় লাগতো। এই বাড়িতে ভূত আছে। মেয়ে-ভূত। সব সময় ঘোমটা দিয়ে থাকে। আমি নিজে একদিন দেখেছি। ইন্টারেস্টিং স্টোরি, মনে করিয়ে দিস- তোকে বলব।'

টিফিন কেরিয়ার হাতে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। লিলি তাঁকে কোনদিন দেখেনি অথচ লিলির দিকে তাকিয়ে তিনি পরিচিত ভঙ্গিতে হাসলেন। সামান্যতম অবাকও হলেন না। যেন দুপুর একটায় এ বাড়িতে লিলি থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

ভদ্রলোক সহজ গলায় বললেন, 'খাবার আনতে দেরি হয়ে গেল। প্রেসক্লাবের সামনে এমন এক যানজট।'

স্বাতী বলল, 'খাবার কোথেকে এনেছ? হোটেলের খাবার?'

'না। সেগুনবাগিচায় আমার এক খালা থাকেন। ওনাকে রেঁধে রাখতে বলেছিলাম।'

'আচ্ছা শোন, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই। ও হচ্ছে লিলি, তোমাকে অসংখ্যবার ওর কথা বলেছি।'

'হ্যাঁ। বলেছ।'

স্বাতী আনন্দিত গলায় বলল, 'লিলি সম্পর্কে তোমাকে কি বলেছি লিলিকে একটু বল। ও শুনলে খুশি হবে।'

ভদ্রলোক আবারও লিলির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আর ঠিক তখনি লিলি এই ভদ্রলোকের আকর্ষণী ক্ষমতার কারণ বুঝতে পারল। ভদ্রলোক অসম্ভব সুন্দর করে হাসেন। তিনি শুধু

চোখে-মুখে হাসেন না, সমস্ত শরীর দিয়ে হাসেন।

'আহা বল না আমি লিলি সম্পর্কে কি বলেছি।'

'তুমি বলেছ, লিলি কখনো মিথ্যা কথা বলে না।'

'এটা তো বলেছিই, এটা ছাড়া আর কি বলেছি?'

'বলেছ- লিলি হচ্ছে উপন্যাসের চরিত্রের মত নিখুঁত ভাল মেয়ে।'

স্বাতী বিরক্ত স্বরে বলল, 'আসল কথাটা তুমি বলছ না। আসল কথাটা এবং যেটা শুনলে লিলি খুশি হবে। তুমি আসল কথা এড়িয়ে শুধু নকল কথা বলছ।'

'ও বলেছে, পৃথিবীতে নিখুঁত সুন্দর বলে যদি কোন মেয়ে থাকে সে লিলি।'

স্বাতী বলল, 'আমি ঠিক বলেছি না নিজের বন্ধু বলে বাড়িয়ে বলেছি?'

ভদ্রলোক এই কথার জবাব দিলেন না। ব্যাপারটা লিলির পছন্দ হল। লিলি যে অস্বস্তি বোধ করছে তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। এই অস্বস্তি তিনি আর বাড়াতে চাচ্ছেন না। সাধারণত মানুষ নিজের অস্বস্তির দিকেই লক্ষ্য রাখে অন্যদের অস্বস্তির দিকে না।

লিলি বলল, 'আমি এখন উঠব।'

ভদ্রলোক খুবই বিস্মিত হলেন। হাসির মত তাঁর বিস্ময়ও সারা শরীরে ধরা পড়ল।

'তুমি চলে যাবে কেন? তোমার না এখানে দুপুরে খাবার কথা! তিনজনের খাবার এনেছি।'

লিলি যা ভেবেছিল তা-ই। তাকে এখানে নিয়ে আসা স্বাতীর পূর্ব পরিকল্পনার অংশ। হুট করে এই ব্যাপারটা সে করেনি। ক্লাসের নাটকটা সে ইচ্ছে করেই করেছে।

ভদ্রলোক বললেন, 'লিলি, আমি এক্ষুণি খাবার দিয়ে দিচ্ছি। দু' মিনিটের বেশি লাগবে না। সবই গরম আছে। খেয়ে যাও।'

স্বাতী বলল, 'তুমি খাবার বেড়ে ফেল। ও যাবে না। দুপুর একটার সময় ও গিয়ে করবেই-বা কি। ক্লাস হচ্ছে তিনটায়। কি রে লিলি, থাকবি কিছুক্ষণ?'

'আচ্ছা, থাকব।'

'প্লীজ থাক। তিনজন মিলে জমিয়ে আড্ডা দেব। দু'জনে গল্প জমে না। গল্পের জন্য সব সময় তৃতীয় ব্যক্তির দরকার। তৃতীয় ব্যক্তি হল প্রভাবক -দ্যা ক্যাটালিস্ট।'

ভদ্রলোক টেবিলে থালা-বাসন রাখছেন। লিলির বোধহয় সাহায্য করা উচিত। এই কাজগুলি সাধারণত মেয়েরাই করে। কিন্তু লিলি কিছু করল না। আগের মতই চেয়ারে বসে রইল। তার হতভম্ব ভাব পুরোপুরি কাটেনি। সে সারাক্ষণই অবাক হয়ে স্বাতীকে দেখছে।

স্বাতী বলল, 'গরমে আমার গা ঘামছে। ঘামা গা নিয়ে আমি কিছু খেতে পারব না। আমি চট করে গোসল করে আসি। বেশিক্ষণ লাগবে না। তুমি এর মধ্যে লিলিকে তোমাদের বাড়ির ঘোমটা-ভূতের গল্পটা বল। সুন্দর করে বলবে। এক লাইনে বলবে না।'

লিলির মনে হল- স্বাতী কি বাড়াবাড়ি করছে না? লোক-দেখানো বাড়াবাড়ি। লিলির চোখে আঙুল দিয়ে দেখান যে এইবাড়ি এখন তার বাড়ি। সে এই বাড়িতে যা ইচ্ছা করতে পারে। করুক যা ইচ্ছা কিন্তু তাকে সামনে বসিয়ে কেন?

স্বাতী ভেতরের দিকে চলে গেল। ভদ্রলোক বসলেন স্বাতীর চেয়ারে। গম্ভীর গলায় বললেন- 'লিলি, তুমি কি ঘোমটা-ভূতের গল্পটা শুনতে চাও?'

লিলি ক্ষীণ স্বরে বলল, 'বলুন।'

'তোমার শুনতে ইচ্ছা করছে না বুঝতে পারছি। দু'জন চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা ভাল- শোন তাহলে, এই বাড়িটা আমার বাবার। তিনি ছিলেন একটা গার্লস স্কুলের হেডমাস্টার। খুব নিরস ধরনের মানুষ ছিলেন। আমার যখন তিন মাস বয়স তখন আমার মা মারা যান। তিনি আর বিয়ে করেননি। মা'র মৃত্যুর পর ৩০ বছর বেঁচে ছিলেন। একাকী বেঁচে থাকা। এই ধরনের মানুষদের এক সময় নানান টাইপের সমস্যা দেখা দেয়। বাবারও দেখা দিল। তিনি এক সময় বলতে শুরু করলেন- ঘোমটা পরা একটা ভূত তাঁকে বিরক্ত করে। রাতে বাবা যখন ঘুমুতে যান তখন সে আসে। খুব সাবধানে মশারি তুলে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাবা চিৎকার করে উঠলে মিলিয়ে যায়। শেষের দিকে এমন হল যে বাবা একা ঘুমুতে পারতেন না- আমাকে তাঁর সঙ্গে ঘুমুতে হত। এই হল ঘোমটা-ভূতের গল্প।'

'এই ভূতটাকে শুধু আপনার বাবাই দেখেছেন?'

'না। আরও অনেকে দেখেছে। এ বাড়িতে যারা কিছুদিন থাকে তারাই বেশি করে দেখেছে। স্বাতীও না-কি দেখেছে।'

'আপনি ভূত-প্রেত এই সব বিশ্বাস করেন না?'

'দেখিনি তো, এই জন্যে বিশ্বাস করি না। দেখলে হয়ত করব।'

'স্বাতীর সঙ্গে আপনার পরিচয় হল কিভাবে?'

'স্বাতী তোমাকে বলেনি?'

'জ্বি-না।'

'ওকে জিজ্ঞেস করলে ও তোমাকে সুন্দর করে বলবে। অবশ্যি সুন্দর করে বলার কিছু নেই। আমার মেয়ের মাধ্যমে ওর সঙ্গে পরিচয়।'

'আপনাদের বিয়ে কবে হচ্ছে?'

'সামনের সপ্তাহে, বুধবার।'

'ও আচ্ছা।'

তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে স্বাতী বের হয়ে বলল, 'দারুণ খিদে লেগেছে, এস খেতে বসি। লিলি, তুই হাত-মুখ ধুবি?'

লিলি বলল, 'না।'

স্বাতীর চুল ভেজা। শাড়ি অগোছালোভাবে পরা। সে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে কি সুন্দর বউ-বউ লাগছে! এই নির্জন ছায়া ছায়া বাড়িটায় তাকে সুন্দর মানিয়ে গেছে!

'তোর খুব খিদে লেগেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি কিছু খাব না। আমি চলে যাব।'

'এই না বললি থাকবি।'

'এখন আর থাকতে ইচ্ছা করছে না।'

'আর পাঁচটা মিনিট থেকে খেয়ে গেলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়?'

'মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। মহাভারত ঠিকই থাকে কিন্তু আমি এখন চলে যাব।'

'যা, চলে যা।'

'রাগ করেছিস?'

'কথা বাড়াবার দরকার নেই- তুই চলে যা। তুমি ওকে রিকশায় তুলে দিয়ে এস।'

লিলি দরজার দিকে রওনা হল।

ভদ্রলোক শিশির সঙ্গে সঙ্গে আসছেন।

রিকশা চলছে। রাস্তা খানা-খন্দে ভরা। খুব ঝাঁকুনি হচ্ছে। শিশির মনে হচ্ছে হেঁটে গেলেই হত। স্বাতী খুব মন খারাপ করেছে। তাছাড়া বাসায় ফিরতেও তার ইচ্ছে করছে না। তাদের বাড়িটা কুৎসিত ধরনের বাড়ি। এই বাড়িতে বারবার ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না। শিশির মনে হচ্ছে তার নিজেরও জ্বর আসছে। স্বাতীর জ্বরটাই চলে এসেছে তার গায়ে।

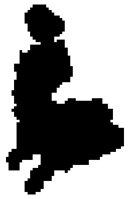

……

স্বাতীর ঘরের দরজা বন্ধ। পর্দা টানানো। ঘর অন্ধকার, সে সন্ধ্যার পর বাতি জ্বালায়নি। নাজমুল সাহেব ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন। তিনি স্বাতীর ঘরের বারান্দার সামনে দিয়ে কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করলেন। একবার ডাকলেন, 'স্বাতী কি করছিস মা?'

স্বাতী জবাব দিল না। নাজমুল সাহেব জবাবের জন্যে কান পেতে ছিলেন। তিনি শুনলেন ভেতরে মিউজিক হচ্ছে। ট্রাম্পেট। স্বাতীর প্রিয় বাজনা। ট্রাম্পেট আনন্দময় সঙ্গীত। মার্শাল মিউজিক, যে মিউজিক উৎসবের কথা মনে করিয়ে দেয়। দরজা জানালা বন্ধ করে, বাতি নিভিয়ে আনন্দময় বাজনা শুনতে হবে কেন? নাজমুল সাহেব চিন্তিত মুখে একতলায় নামলেন।

রওশন আরা রান্নাঘরে। তিনি বই দেখে একটা চাইনিজ স্যুপ তৈরি করছেন। স্বাতী বিকেলে বলেছে তার শরীর ভাল লাগছে না, রাতে কিছু খাবে না। দুপুরেও ভাল মত খায়নি। ভাত নাড়াচাড়া করে উঠে পড়েছে। নাজমুল সাহেবকে রান্নাঘরে দেখে তিনি চোখ তুলে তাকালেন। ব্লেন্ডারে হাড় ছড়ানো মুরগীর মাংস দেয়া হয়েছে। ব্লেন্ড করতে হবে। কড়াইয়ে সয়াসস মেশানো সব্জি ফুটছে। ব্লেন্ড করা মাংস কড়াইয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তাঁর হাতে সময় নেই। তিনি বিরক্ত চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন।

নাজমুল সাহেব বললেন, 'স্বাতীর কি হয়েছে বল তো?'

'কেন?'

'সন্ধ্যা থেকে দেখছি- ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। ঘরে বাতি জ্বালে নি।'

রওশন আরা বললেন, 'মাথা টাথা ধরেছে। শুয়ে আছে।'

'কিছুদিন থেকেই তার মধ্যে অস্থির ভাবটা লক্ষ্য করছি।'

'এই বয়সে অস্থির ভাব আসে। আবার চলে যায়। এটা কিছু না।'

নাজমুল সাহেব চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। রওশন আরা বললেন, 'তুমি রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে থেক না। আমি কাজ করছি।'

'কাজ কর। তোমার কাজ তো আমি নষ্ট করছি না।'

'করছ। কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে আমি রান্না বান্না করতে পারি না।'

নাজমুল সাহেব বের হয়ে এলেন। আবার দোতলায় গেলেন। সন্ধ্যা থেকে তাঁর নিজেরও খুব একা একা লাগছে। স্বাতীর সঙ্গে গল্প করতে পারলে ভাল লাগত। সবচে ভাল হত স্বাতীকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেলে। বেড়ানোর জায়গা তেমন নেই। তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সংখ্যা

সীমিত। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গেও যোগাযোগ নেই। তিনি কোথাও যান না। কেউ এলে আনন্দিত হন না। বিরক্ত বোধ করেন। সারাজীবন কোর্টে বিচারকের চেয়ারে বসার এই হল কুফল। এই চেয়ার মানুষের ভেতর থেকে মানবিক গুণ আস্তে আস্তে শুষে নিয়ে যায়। মানুষটা আর পুরোপুরি মানুষ থাকে না। মানুষের ছায়া হয়ে যায়।

তিনি স্বাতীর ঘরের দরজায় হাত রেখে ডাকলেন, 'স্বাতী মা, কি করছিস?'

'কিছু করছি না বাবা। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছি।'

'কেন?'

'এমি।'

'তোর সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করা যাবে?'

'হ্যাঁ যাবে।'

স্বাতী দরজা খুলে দিল। মিউজিক সেন্টারের নব ঘুরিয়ে শব্দ কমিয়ে দিয়ে হালকা গলায় বলল, 'তোমাকে গল্প করতে হবে অন্ধকারে বসে। অসুবিধা হবে না তো বাবা?'

'না। ঘর অন্ধকার কেন?'

'কেন জানি আলো চোখে লাগছে। বাবা তুমি খাটে এসে পা তুলে বোস। কি নিয়ে গল্প করতে চাও।'

'তোর পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?'

'মোটামুটি। ভাল না।'

'ভাল না কেন?'

'স্যাররা ইন্টারেস্টিং করে পড়াতে পারেন না। একঘেঁয়ে বক্তৃতা দেন। শুনতে ভাল লাগে না। ক্লাসে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতেই আমার বেশি ভাল লাগে। স্যার বক্তৃতা করেন, আমরা মজার মজার নোট নিজেদের মধ্যে চালাচালি করি।'

'তোর কি অনেক বন্ধু-বান্ধব?'

'আমার একজনই বন্ধু।'

'লিলি?'

'হ্যাঁ লিলি।'

'ওকে তোর এত পছন্দ কেন?'

'বাবা ও খুব বিশ্রী পরিবেশে বড় হচ্ছে, তারপরেও সে বড় হচ্ছে নিজের মত করে। ও হচ্ছে এমন একটা মেয়ে যে জীবনে কোন দিন মিথ্যা কথা বলেনি।'

'তাই না-কি?'

'হ্যাঁ তাই। ও কেমন মেয়ে তোমাকে বুঝিয়ে বলি বাবা- ধর, আমি ভয়ংকর কোন অন্যায় করলাম, তোমরা সবাই আমাকে ত্যাগ করলে। ও তা করবে না। ও আমার পাশে থাকবে।'

'তুই কি কোন অন্যায় করেছিস?'

'না।'

'তোর কি কোন সমস্যা হয়েছে? তুই কি কোন সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিস?'

'হুঁ।'

'সমস্যাটা কি?'

'আমার সমস্যা আমি নিজেই মিটাতে চাচ্ছি। এই জন্যে তোমাদের বলতে চাচ্ছি না।

তেমন বড় কিছু সমস্যা না। সমস্যা যদি খুব বড় হয়ে দেখা দেয় তখন তোমাদের বলব।'

নাজমুল সাহেব অত্যন্ত চিন্তিত বোধ করছেন। স্বাতীর ব্যাপারটা তিনি ধরতে পারছেন না। তিনি অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে মেয়েকে টেনে নিয়ে কোমল গলায় বললেন, 'মা শোন! আমি তো পুরানো দিনের মানুষ। তোদের এ কালের সমস্যার ধরন-ধারন আমি জানি না। তারপরেও বলছি, তোর সমস্যা মেটানোর চেষ্টার ত্রুটি আমার দিক থেকে কখনো হবে না। মনে করা যাক তুই একটি ছেলেকে পছন্দ করেছিস, যাকে আমাদের পছন্দ না। যাকে কিছুতেই আমরা গ্রহণ করতে পারছি না- তারপরেও আমরা তোর সুখের দিকেই তাকাব।'

'সেটা আমি জানি।'

'তাহলে তুই এমন ঘর-দোর অন্ধকার করে বসে আছিস কেন?'

'বাতি জ্বালাব?'

'হুঁ।'

স্বাতী বাতি জ্বালাল। বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল। নাজমুল সাহেব হাসি মুখে বললেন, 'তোর কালেকশনে কোন নাচের মিউজিক আছে?'

'আছে।'

'তাহলে সুন্দর একটা নাচের মিউজিক দে তো মা। ছোটবেলার ঐ নাচটা দেখাবি? মাই লিটল ড্যানসার- ছোট্ট নর্তকী।'

স্বাতী হাসছে। নাজমুল সাহেব হাসছেন।

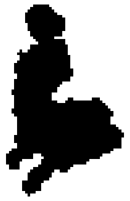

আজ স্বাতীর বিয়ে। গোপন বিয়ে অল্প কয়েকজন শুধু জানে। লিলি সেই অল্প কয়েকজনের একজন। সে স্বাতীদের বাসার সামনে ভয়ে ভয়ে রিকশা থেকে নামল। তার হাত পা কাঁপছে। সে রিকশা থেকে নেমে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আজ স্বাতীদের বাসা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

লিলির স্বপ্নের বাড়ির সঙ্গে স্বাতীদের বাড়িটার খুব মিল আছে। শুধু একটাই অমিল, লিলির স্বপ্নের বাড়ি একতলা, স্বাতীদেরটা দোতলা। স্বাতীদের বাড়ির ছাদে ওঠার ব্যবস্থা নেই, সিঁড়িঘর করা হয়নি। আর লিলির স্বপ্নের বাড়িতে ছাদটাই প্রধান। সেই ছাদে একটা সিঁড়িঘর আছে। এই দু'টি অমিল ছাড়া আর কোন অমিল নেই।

স্বাতীর বাবা লিলির কল্পনার বাবার চেয়েও ভাল। তিনি রিটায়ার করে ঘরে আছেন। সারাক্ষণই কাজ নিয়ে থাকেন। লিলি কখনো তাঁকে কাজ ছাড়া বসে থাকতে দেখেনি। হয় বাগানে কাজ করছেন, নয় কাঠের কাজ করছেন। মুখে কোন বিরক্তি নেই। স্বাতীর কোন বন্ধু-বান্ধবকে দেখলে এত আগ্রহ করে কথা বলেন। হেন তেন কত রসিকতা। আর লিলির বাবা লিলির বন্ধুদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকান। ভাবটা এ রকম- এরা কেন এসেছে? কি চায়? লিলির বন্ধুরা যদি বলে স্লামালিকুম চাচা, তাহলে তিনি বিরক্ত মুখে বলেন, হুঁ। বলেই ওদের সামনেই নাক ঝাড়েন। নাক ঝাড়ার ব্যাপারটা দু' মিনিট পরেও করতে পারেন, তা করবেন না। মাঝে মাঝে লিলির মনে হয় ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত।

লিলি আজ স্বাতীদের বাড়িতে ঢুকছে ভয়ে ভয়ে। স্বাতীর বাবা নাজমুল সাহেবের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়। যদি তিনি বলেন, এত সেজেগুজে বের হয়েছ- কি ব্যাপার? তাহলে লিলি কি বলবে? তাঁকে নিশ্চয়ই বলা যাবে না- আজ আপনার মেয়ে গোপনে বিয়ে করবে। আমি তাকে নিতে এসেছি।

লিলি কিছু না বললেও একদিন তো সব জানাজানি হবে। তখন যদি লিলির সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং তিনি বলেন- মা, তোমাকে এত স্নেহ করি আর এত বড় একটা ঘটনা সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছুই বললে না? এটা তো মা, তোমার কাছ থেকে আশা করিনি।

নাজমুল সাহেব বসার ঘরের বারান্দায় মাদুর পেতে বসেছেন। কেরোসিন কাঠ দিয়ে বাক্স জাতীয় কি যেন বানাচ্ছেন। কাঠমিস্ত্রীদের মত তাঁর কানে পেনসিল গোঁজা। হাতে ছোট্ট একটা করাত। লিলিকে দেখে তিনি হাসি মুখে বললেন, 'কেমন আছ গো লিলি মা মণি?'

লিলি বলল, 'ভাল। কি বানাচ্ছেন চাচা?'

'আগে বলব না। বানান হোক তারপর সবাইকে চমকে দেব।'

'স্বাতী কি বাসায় আছে?'

'হ্যাঁ আছে। মেয়েটির কোন সমস্যা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। খুব অস্থির। অকারণে একবার দোতালায় যাচ্ছে, একবার নামছে। সকালে নাশতা খায়নি- শরীর নাকি ভাল না। তোমাদের কি কোথাও যাবার কথা?'

লিলি জবাব দিল না। তার বুক টিপ টিপ করছে। বেশিক্ষণ জেরা করলে সত্যি কথা বলে ফেলবে। নাজমুল সাহেব বললেন, 'সোজা দোতলায় উঠে যাও মা। ও ঘন্টাখানিক ধরে দোতলায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। যাবার আগে আরেকটা কাজ করতে পারবে মা?'

'অবশ্যই পারব।'

'রান্নাঘরে গিয়ে তোমার চাচীকে বল আমাকে এক কাপ চা দিতে। কড়া করে যেন বানায়।'

লিলি রান্নাঘরের দিকে রওনা হল। স্বাতীর মা রওশন আরা লিলির দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসলেন যেন লিলি তাঁরই একটা মেয়ে। অন্যের মেয়েদের দিকে এমন আপন করে তাকান যে কত বড় গুণ তা কি এই মহিলা জানেন?

লিলি বলল, 'চাচী খুব কড়া করে এক কাপ চা চাচাকে দিন।'

রওশন আরা বললেন, 'আচ্ছা দিচ্ছি। তোমাকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছে বলেই দিচ্ছি। তোমার চাচার চা নিষেধ হয়ে গেছে। ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে। চিনি একেবারেই বন্ধ। আর এদিকে তার ঘন ঘন চা খাবার অভ্যাস। শুধু লিকার হলে কথা ছিল একগাদা চিনি দিয়ে চা বানাতে হয়।'

'বাজারে স্যাকারিন জাতীয় কি না-কি পাওয়া যায় চাচী?'

'পাগল হয়েছ, তোমার চাচা খাবে স্যাকারিনের চা? মুখে দিয়েই থু করে ফেলে দেবে না? দিয়ে দেখেছিলাম। লিলি তুমি কি খাবে বল।'

'আমি কিছু খাব না চাচী।'

'বললেই হবে? তুমি আজ সারাদিন থাক। দুপুরে খেয়ে দেয়ে তারপর যাবে। স্বাতীর কি হয়েছে তুমি কি কিছু জান লিলি?'

লিলি শংকিত গলায় বলল, 'কেন চাচী?'

'ও কাল রাত থেকে কেমন ছটফট করছে। সকালেও কিছু খায়নি। আমাকে কিছু বলল না। তুমি জিজ্ঞেস কর তো ব্যাপার কি?'

'আচ্ছা চাচী, আমি জিজ্ঞেস করব।'

লিলি দোতলায় উঠে গেল। দোতলার টানা বারান্দার শেষ মাথায় স্বাতী দাঁড়িয়ে আছে। লিলিকে তার দিকে আসতে দেখেও সে নড়ল না। যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সেইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। লিলি যখন ডাকল, এই স্বাতী, তখনি সে নড়ে চড়ে উঠল। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'তুই এত সুন্দর শাড়ি কবে কিনলি? আগে দেখিনি তো? তোকে অদ্ভুত লাগছে। মনে হচ্ছে কুইন অব শেবা।'

লিলি হকচকিয়ে গেল। স্বাতীর ব্যাপারটা সে বুঝতে পারছে না। কেমন পাগলী পাগলী চেহারা। মনে হচ্ছে দু'দিন চুলে চিরুনী দেয়নি। চুল জট ধরে আছে। চোখের নীচে কালি।

কিছুক্ষণ আগে মনে হয় পান খেয়েছে। দাঁত লাল হয়ে আছে। পরে আছে সাধারণ একটা শাড়ি। লিলি বলল, 'তুই এখনো রেডি হোসনি? সাড়ে এগারোটা বাজে। আমাদের না বারোটার মধ্যে যাবার কথা?'

স্বাতী এমনভাবে তাকাল যেন লিলির কথা বুঝতে পারছে না। সে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'মিষ্টি পান খাবি লিলি? আমার ছোট মামা কোলকাতা থেকে এক গাদা মিষ্টি পান প্যাকেট করে নিয়ে এসেছে। আচ্ছা বল দেখি মিষ্টি পান কোন আনার জিনিস? আমি অবশ্যি একটার পর একটা পান খেয়ে যাচ্ছি। দেখ, পান খেয়ে দাঁতের কি অবস্থা করেছি।'

লিলি বলল, 'তোর ব্যাপারটা কি? আজ না তোর বিয়ে। ভুলে গেছিস?'

স্বাতী হাসল। লিলি বলল, 'এরকম অদ্ভুত করে হাসছিস কেন?'

'একটা ব্যাপার হয়েছে। আয় ঘরে আয়, বলছি।'

স্বাতী হাত ধরে লিলিকে তার ঘরে নিয়ে গেল। চাপা গলায় বলল, 'চুপ করে বোস। আমি আসছি। এক্ষুণি আসছি। তোকে এই শাড়িটাতে দারুণ লাগছে। দাম কত নিল? এক হাজারের উপরে নিশ্চয়ই।'

'পনের শ'।'

'দাম বেশি নিয়েছে। তবু সুন্দর। আমার গায়ের রঙ তোর মত ফর্সা হলে আমিও কিনতাম।'

'তোর ব্যাপারটা কি আগে শুনি।'

স্বাতী প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আমি ঠিক করেছি যাব না।'

'কখন ঠিক করলি?'

'কাল রাতে। ঠিক এগারোটার সময়। সারারাত আর ঘুম হয়নি। তাকিয়ে দেখ এক রাতে চোখে কালি পড়ে গেছে। সকালে এমন মাথা ঘুরছিল মনে হচ্ছিল পড়ে যাব।'

'হঠাৎ এ রকম ডেসিশান নিলি কেন?'

স্বাতী আঙুল দিয়ে শাড়ি পেঁচাচ্ছে। খুব যেন অস্বস্তিতে পড়ে গেছে।

'কথা বলছিস না কেন?'

'মন স্থির করতে পারছি না।'

'বিয়ে পিছিয়ে দিচ্ছিস?'

স্বাতী জবাব দিল না। আঙুলে চুলের জট সারাবার চেষ্টা করতে লাগল। লিলি বলল, 'ওনাকে জানিয়েছিস?'

'কাকে? হাসনাতকে?'

'হুঁ।'

'না।'

'উনি তো বসে অপেক্ষা করতে থাকবেন।'

স্বাতী বলল, 'দাঁড়া তোর জন্যে মিষ্টি পান নিয়ে আসি।'

'মিষ্টি পান আনতে হবে না। তুই বোস।'

স্বাতী বলল, 'আমার মনে হয় জ্বর এসেছে, দেখ তো গায়ে হাত দিয়ে।'

লিলি স্বাতীর কপালে হাত দিল। কপাল ঠান্ডা, জ্বর নেই। স্বাতী বলল, 'লিলি তুই আসায় খুব ভাল হয়েছে। আমি একটা চিঠি লিখে রেখেছি, ওর হাতে দিবি। চিঠিতে গুছিয়ে সব কিছু লেখা আছে।'

'আমি কোন চিঠি দিতে পারব না। তোদের এই হাই-ড্রামার মধ্যে আমি নেই। আমি এক্ষুণি বিদেয় হচ্ছি।'

'আচ্ছা থাক, চিঠি দিতে হবে না। মুখে বলবি। বলবি আমার ভয়ংকর জ্বর। উঠে বসার উপায় নেই। বিছানায় এলিয়ে পড়ে আছি। মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। জ্বরটা কমলেই আমি এসে সব গুছিয়ে বলব।'

লিলি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'আমি এসব কিছুই বলতে পারব না। আমি বাসায় যাচ্ছি।'

স্বাতী হাত ধরে লিলিকে বসিয়ে দিল। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'তোর পায়ে ধরছি লিলি তুই গিয়ে বল। তুই তো আবার সত্যি ছাড়া মিথ্যা বলতে পারিস না। আচ্ছা সত্যি কথাটাই বল।'

'সত্যি কথাটা কি?'

স্বাতী নিচু গলায় বলল, 'সত্যি কথাটা হচ্ছে আমি ওকে বিয়ে করব না। দ্যা গেম ইজ ওভার।'

লিলি হতভম্ব গলায় বলল, 'ওনার অপরাধটা কি?'

'কোন অপরাধ নেই। আমি অনেক চিন্তা চিন্তা করে বের করেছি- ওকে আমার পছন্দ হয়নি। ওর সংসার পছন্দ হয়েছে, ওর মেয়েটা পছন্দ হয়েছে, ওর ছবি পছন্দ হয়েছে। আমি চেয়েছিলাম মানুষটাকে ভালবাসতে।'

স্বাতী বলল, 'চা খাবি?'

'চা খাব না।'

'আহ খা-না, কতক্ষণ লাগবে চা খেতে। আমি যাব আর আসব। চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবি? মা বড়া ভাজছে।'

স্বাতী চা আনতে গেল। গেল যে গেল আর আসার নাম নেই। অস্বস্তি নিয়ে লিলি অপেক্ষা করছে। সে বুঝতে পারছে না এখান থেকে বাসায় চলে যাবে না কাজি অফিস হয়ে যাবে। ওনার সঙ্গে তার পরিচয় এমন না যে নানান সান্ত্বনার কথা-টথা বলে বিয়ে ভাঙার খবর দেবে। একদিনই সামান্য কথা হয়েছে।। মানুষটাকে গম্ভীর ধরনের মনে হয়েছে। তবে অপছন্দ হয়নি। ভাল মানুষ বলে মনে হয়েছে। লিলি তাকে কি করে বলবে- "স্বাতী ঠিক করেছে আপনাকে বিয়ে করবে না। দ্যা গেম ইজ ওভার।"'

স্বাতী প্লেট ভর্তি বড়া আর চা নিয়ে এল। হাসি মুখে বলল, 'একেবারে আগুন গরম। কড়াই থেকে নামিয়ে এনেছি। ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা করে খা। আরেকটু ঝাল হলে ভাল হত। ভাজাভুজি ঝাল না হলে ভাল লাগে না।'

স্বাতী এখন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলছে। শব্দ করে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। পা নাচাচ্ছে। তার পা নাচানোর বিশ্রী অভ্যাস আছে।

লিলি বলল, 'আমি উঠি?'

স্বাতী বলল, 'চল আমি তোকে রিকশায় তুলে দিয়ে আসি।'

'রিকশায় তুলে দিতে হবে না।'

'আহা চল না।'

রিকশায় তুলে দেবার কথা বলেও বসার ঘরের দরজা পর্যন্ত এসে স্বাতী থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার এখন আর তোকে এগিয়ে দিতেও ইচ্ছা করছে না– তুই একাই যা।'

স্বাতী বসার ঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে কেমন ক্লান্ত এবং হতাশ লাগছে। লিলির মনে হল এখন সে যদি একবার বলে– মন থেকে এইসব ঝামেলা দূর করে চল তো আমার সঙ্গে। মানুষটা খারাপ না। বিয়ে করে তুই সুখি হবি। তাহলে স্বাতী বলবে– আচ্ছা একটু দাঁড়া আমি কাপড় বদলে আসি।

লিলি দেখল স্বাতীর চোখে পানি এসে গেছে। স্বাতীর বড় বড় চোখ। চোখ ভর্তি পানি। কি সুন্দর যে লাগছে।

মগবাজার কাজী অফিসের সামনে হাসনাত দাঁড়িয়ে আছে। সে একা না। তার সঙ্গে তিন চারজন বন্ধু–বান্ধব আছে। তাদের মুখ হাসি হাসি হলেও এক ধরনের চাপা টেনশান টের পাওয়া যায়। প্রত্যেকের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। প্যাকেট খুলে সবাই নিশ্চয়ই একসঙ্গে ধরিয়েছে।

হাসনাতের চুল সাধারণত এলোমেলো থাকে। আজ সুন্দর করে আঁচড়ানো। তাড়াহুড়ো করে শেভ করায় থুতনির কাছে গাল কেটেছে। রক্ত জমাট বেঁধে আছে। তার পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবি স্বাতীর দেয়া উপহার। পাঞ্জাবি মাপ মত হয়নি, বড় হয়েছে। মৌলানাদের পাঞ্জাবির মত লাগছে। হাসনাতকে কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

লিলি রিকশা থেকে নামতেই সবাই আগ্রহ নিয়ে তাকাল। হাসনাত একটু এগিয়ে এসে বলল, 'আমার কাছে ভাংতি আছে ভাড়া দিচ্ছি– তুমি ভেতরে চলে যাও লিলি। ভেতরে আমার বড় খালা আছেন তুমি দেরি করলে কেন?'

লিলি কি বলবে চট করে বুঝে উঠতে পারল না। হাসনাত রিকশা ভাড়া দিতে দিতে বলল, 'তোমার বান্ধবী অবশ্যি এখনো আসেনি। দেরি করছে কেন বুঝলাম না।'

লিলি বলল, 'হাসনাত ভাই, আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।'

'বল কি ব্যাপার।'

লিলি ইতস্তত করছে। কথাটা বলার জন্যে একটু ফাঁকা জায়গা দরকার। রাস্তার উপরে ফাঁকা জায়গা কোথায়?

হাসনাত বিস্মিত হয়ে বলল, 'জরুরী কোন কথা?'

'জ্বি।'

'এসো রাস্তা ক্রস করে ঐ মাথায় যাই। তোমার বলতে কি সময় লাগবে?'

'জ্বি না।'

তারা রাস্তা পার হল। লিলির খুব খারাপ লাগছে। কথাটা শুনে উনি কি করবেন সে অনুমান করতে পারছে না। রেগে যাবেন না তো?

'লিলি বল।'

লিলি ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আমি এখানে আসার আগে স্বাতীর বাসা হয়ে এসেছি। আমার কথা ছিল আমি স্বাতীকে নিয়ে আসব। স্বাতী আমাকে বলেছে আপনাকে যেন বলি, সে আসতে পারবে না।'

হাসনাত তাকিয়ে আছে। লিলি চোখ নামিয়ে নিল। তার যা বলার সে বলে ফেলেছে। আর

কি বলবে বুঝতে পারছে না।

'স্বাতী আসবে না?'

'জ্বি না।'

'ও, আচ্ছা। তোমার কাছে কি চিঠি পত্র কিছু দিয়েছে?'

'জ্বি না।'

লিলি বলল, 'আমি চলে যাই।'

'এসো রিকশা করে দি। এখানে রিকশা পাওয়া মুশকিল।'

লিলি ভেবেছিল তার কথা উনি বিশ্বাস করবেন না। নানান প্রশ্ন টশ্ন করবেন। সে রকম কিছু হল না। হাসনাত লিলির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। লিলির বলতে ইচ্ছে করছে, 'আপনি চলে যান আপনাকে রিকশা ঠিক করে দিতে হবে না। আমি ঠিক করে নেব।'

এতগুলি কথা বলার মত শক্তি এখন তার নেই। মানুষটা যে রিকশার জন্যে তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে এটা একদিক দিয়ে ভালই। তিনিও চিন্তা করার সময় পাচ্ছেন। তাঁকে ফিরে গিয়ে বন্ধুদের ব্যাপারটা বলতে হবে। কি বলবে এটা ভাবার জন্যেও সময় দরকার।

রিকশা না, বেবিটেক্সি পাওয়া গেল। হাসনাত দরদাম করে ভাড়া ঠিক করল। মগবাজার থেকে রাজিয়া সুলতানা রোড। কুড়ি টাকা। লিলির একটু আশ্চর্য লাগছে এরকম অবস্থায় কেউ বেবিটেক্সিওয়ালার সঙ্গে দরদাম করতে পারে। বেবীটেক্সি ভাড়াও হাসনাত টেক্সিওয়ালার হাতে দিয়ে দিল। দু'টা চকচকে দশ টাকার নোট। মনে হয় বিয়ে উপলক্ষে কিছু চকচকে নতুন নোট ভদ্রলোক জোগাড় করেছেন।

বিদায় নেবার আগেই বেবীটেক্সিওয়ালা হুস করে বের হয়ে গেল।

হাসনাতের হাতের সিগারেট নিভে গেছে। সে পান সিগারেটের দোকান থেকে দেয়াশলাই কিনে সিগারেট ধরাল। সে কাজী অফিসের দিকে যাচ্ছে।

লিলির নিজেদের বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। নতুন কোন জায়গায় যেতে ইচ্ছে করছে। শান্ত নিরিবিলি ধরনের কোন জায়গা। হৈ চৈ চেঁচামেচি নেই, ছায়া ছায়া ধরনের কোন জায়গা। যেখানে প্রচুর গাছপালা। গাছপালার ভেতর ছোট্ট একটা বাড়ি। বাড়ির খুব কাছেই নদী। নদীতে নৌকা টৌকা কিছু নেই। শুধুই নদী। কিংবা পুকুরও থাকতে পারে। বড় পুকুর, যার পানি কাচের মত। এত সুন্দর সেই পানি যে দেখলেই গায়ে মাথায় মাখতে ইচ্ছা করে। নদীর ঘাটটা থাকবে মার্বেল পাথরে বাঁধান।

সে তার স্বপ্নের বাড়ি নিয়ে আরও কিছুক্ষণ ভাবতো কিন্তু তার আগেই বাসার কাছে চলে এল। তার মনটা গেল খারাপ হয়ে। কি বিশ্রী একটা বাড়ি। সদর দরজাটা খোলা। যার ইচ্ছা ভেতরে ঢুকছে। যার ইচ্ছা বেরুচ্ছে।

একবার এক ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইতে একেবারে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। আজও দু'জন ফকিরনিকে দেখা গেল বারান্দায় বসে জমিয়ে গল্প করছে। দু'জন দু'জনের মাথার উকুন বাছছে। লিলিকে দেখে তারা এমন ভাবে তাকাল যেন লিলি বাইরের একটা মেয়ে বিনা অনুমতিতে তাদের ঘরে ঢুকে যাচ্ছে।

একতলার বারান্দায় লিলি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বাড়ির পরিস্থিতি বোঝার জন্যে এটা দরকার। কাজের বুয়া এক গাদা কাঁচের বাসন নিয়ে কলঘরের দিকে যাচ্ছে। এক্ষুণি সে একটা

কিছু ঝনঝন করে ভাঙবে। বাসন ভাঙ্গা তার হবি। রোজই ভাঙে। লিলি বলল, 'বুয়া, মা কোথায়?'

'উপরে।'

'কি করছে?'

বুয়া নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'ছোট দুই আফারে দরজা বন্ধ কইরা মারতাছে।'

আশ্চর্য কাণ্ড। বড় বড় দু'টা মেয়েকে দরজা বন্ধ করে মারা হচ্ছে– এটা যেন খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা।

'আফনেরে আইজ সুন্দর–সুন্দর লাগতাছে।'

'তুমি তোমার কাজে যাও বুয়া।'

লিলি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। মার হাত থেকে রুনু ঝুনুকে উদ্ধার করবে কি না বুঝতে পারছে না। আর ভাল লাগে না। দরকার কি উদ্ধার করার। যা ইচ্ছা হোক। লিলি নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছে– ফরিদা তখন বের হয়ে এলেন। মেয়েদের শাস্তি দিয়ে তিনি খানিকটা ক্লান্ত। হাঁপাচ্ছেন। লিলিকে স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'ঐ মেয়েটা বার বার টেলিফোন করছে।'

'কোন মেয়েটা?'

'ঐ যে শ্যামলা মত– কি যেন নাম। তোর কাছে প্রায়ই আসে।'

'শাতী?'

'হুঁ। বলেছে। খুব জরুরী।'

'তুমি কি আবার রুনু ঝুনুকে মারছিলে?'

'না মেরে করব কি?'

ফরিদা নীচে নেমে গেলেন। কাউকে ফার্মেসীতে পাঠিয়ে তুলা স্যাভলন আনাতে হবে। মার খেয়ে ঝুনুর ঠোঁট কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে।

টেলিফোন বাবার ঘরে। তিনি ঘরে নেই কাজেই ঘরে ঢুকে টেলিফোন করা যায়। বাবা থাকলে টেলিফোনের দশ গজের ভেতর যাওয়া যায় না। লিলি টেলিফোন করবে কি করবে না বুঝতে পারছে না। শাতীর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। কথা না বললেও উপায় নেই। শাতী কিছুক্ষণ পর পর টেলিফোন করে যাবে। তারচে কথা বলে ঝামেলা চুকিয়ে দেয়াই ভাল।

শাতী মনে হয় টেলিফোন সেট কোলে নিয়েই বসে ছিল। রিং হওয়া মাত্র শাতী বলল, 'কেমন আছিসরে লিলি?' সে ধরেই নিয়েছে লিলির টেলিফোন। লিলি শুকনো গলায় বলল, 'ভাল।'

'গিয়েছিলি?'

'কোথায় যাব?'

'কাজী অফিসে।'

'কাজী অফিসে আমার তো যাবার কথা না।'

'তারপরেও তো গিয়েছিলি। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমার ব্যাপারটা গুছিয়ে বলেছিস তো?'

'গুছিয়ে বলার কি আছে? তুই আসবি না– সেটা বললাম।'

'কিভাবে বললি?'

'সাধারণ ভাবে বলেছি। আমি তো আর তোর মত নাটক করতে পারি না।'

'সাধারণভাবে মানে কি? এ্যাকজাক্ট ডায়ালগ কি?'

'আমার মনে নেই।'

'আমি যাব না এটা শোনার পর সে কি করল?'

'কিছু করেনি।'

'আচ্ছা, তুই ভাল মত ব্যাপারটা বল না– এরকম করছিস কেন?'

'ভাল মত বলার কিছু নেই। আমি যা বলার বললাম, বেবীটেক্সি নিয়ে চলে এলাম।'

'তার রিএকশান কি ছিল?'

'কোন রিএকশান ছিল না।'

'তুই ঠিকমত বলতে পারছিস না। ওর গায়ে কি ছিল?'

'এত খেয়াল করিনি।'

'সার্ট ছিল না পায়জামা পাঞ্জাবি ছিল?

'পায়জামা পাঞ্জাবি।'

'ক্রীম কালারের পাঞ্জাবি? গলার কাছে হাতের কাজ?'

'বললাম তো, আমি এত খেয়াল করিনি।

'ঐ পাঞ্জাবিটা আমি প্রেজেন্ট করেছিলাম। আড়ং থেকে কিনেছি– নয়শ' টাকা দাম নিয়েছে।'

'টেলিফোন রাখি শাতী?'

'আরে না, টেলিফোন রাখবি কি? আমি তো কথাই শুরু করিনি। আর কে কে এসেছিল।'

'জানি না আর কে কে এসেছিল।'

'ওর খালা এসেছিল?'

'হুঁ।'

'সুস্মিতা এসেছিল?'

'সুস্মিতা কে আমি জানি না।'

সুস্মিতা ওর দূর সম্পর্কের মাসী। আমার কি ধারণা জানিস? আমার ধারণা সুস্মিতার সঙ্গে ওর এক ধরনের সম্পর্ক আছে। তেমন কিছু না, প্লেটোনিক টাইপ। ওর সব কিছুতে কেউ থাকুক বা না থাকুক সুস্মিতা থাকবেই। কি কুৎসিৎ একটা মেয়ে চিন্তা কর– হাসব্যান্ড আছে, ছেলেমেয়ে আছে। তার বড় মেয়ে হলিক্রস কলেজে এবার ইন্টারমিডিয়েট দিচ্ছে।'

'তোর বকবকানি শুনতে ভাল লাগছে না শাতী।'

'তুই কি বাসায় থাকবি?'

'বাসায় থাকব না তো যাব কোথায়?'

'আমি তাহলে চলে আসি।'

'না।'

'না কেন?'

'আমার বাসায় কেউ এলে আমার ভাল লাগে না।'

'ভাল না লাগলেও আসছি। অনেক কথা আছে।'

'প্লীজ, আসিস না। কাল তো ইউনিভার্সিটিতে দেখা হবেই।'

'কাল ইউনিভার্সিটিতে দেখা হবে না। কারণ কাল আমি ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি না। কাজেই আজই দেখা হবে। আমি সন্ধ্যার পর আসব। বাবার কাছ থেকে গাড়ি ম্যানেজ করেছি। ছ'টা থেকে ন'টা এই তিন ঘণ্টার জন্যে গাড়ি পাওয়া গেছে। আমি কিন্তু আসছি সন্ধ্যার পর।'

'না এলে হয় না?'

'হবে না কেন হয়- তবে এলেই ভাল হয়।'

টেলিফোন রেখে লিলি দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তখনি কলঘর থেকে ঝনঝন শব্দ। বুয়া কিছু ভেঙেছে। মা'র চিৎকারে এখন কান ঝালাপালা হবার কথা- চিৎকার শোনা যাচ্ছে না। কেন শোনা যাচ্ছে না এই রহস্য লিলির কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না। সে দেখল ফরিদা ব্যস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছেন। তাঁর হাতে তুলা স্যাভলনের শিশি। তিনি উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'লিলি, তুই ঝুমুকে একটু ডাক্তারখানায় নিয়ে যা তো।'

'কেন?'

'ঠোঁট কেটে গিয়েছে। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।'

'খুব বেশি কেটেছে?'

'খুব বেশি না। অথচ কিন্তু রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। কামিজ রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে।'

'বল কি?'

'আমি কামিজ বদলে দেই, তুই ওকে নিয়ে যা।'

'ঝুমু কোথায়?'

'নীচে।'

ঝুমুকে দেখে লিলি হতভম্ব। আসলেই রক্তে সব ভেসে যাচ্ছে। তুলা ঠোঁটে চেপে বিব্রত ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশেই রুমু। তাকেও বিব্রত মনে হচ্ছে। লিলি বলল, 'তোরা কি করেছিস যে মা এমন করে মারল?'

দু'জনই একসঙ্গে হাসল। লজ্জার চাপা হাসি।

কলতলায় আবার ঝন ঝন শব্দ। বুয়া আরেকটা কিছু ভেঙেছে। প্রথমবার আওয়াজ কোন রিএকশান হয়নি বলে বোধ হয় দ্বিতীয়বার ভাঙা। এবার রিএকশান হচ্ছে- ফরিদা চেঁচাতে চেঁচাতে নামছেন।

ঝুমুর কামিজ বদলানো হয়েছে। কামিজ কাঁধের কাছে অনেকখানি ছেঁড়া। ফরিদা বললেন, ওড়না দিয়ে ঢেকে চলে যা। ঝুমু হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল, কোন কিছুতেই তার আপত্তি নেই। রুমু বলল, 'আমিও ঝুমুর সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাব।' ফরিদা তীব্র গলায় বললেন, 'জ্যান্ত কবর দিয়ে ফেলব। আর যেন কখনো দু'জনকে এক সঙ্গে না দেখি।'

লিলি বলল, 'মা ওরা করেছে কি?'

ফরিদা বিরক্ত গলায় বলল, 'সব সময় যা করে তাই করেছে।'

'কি করে সব সময়?'

'এত কথা বলতে পারব না। ডাক্তারের কাছে নিতে বলছি নিয়ে যা।'

গাড়ি ছিল না। দরকারের সময় গাড়ি কখনো থাকে না। লিলি রিকশা নিল। রিকশায় উঠে

লিলি বলল, 'ব্যথা করছে নাকি রে?'

ঝুমু না সূচক মাথা নাড়ল।

লিলি বলল, 'তোরা দু'জন কি করিস যে মা এ রকম করে মারে?'

ঝুমু লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। লিলি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। ঝুমুর কাছ থেকে প্রশ্নের উত্তরে এর বেশি কিছু পাওয়া যাবে না।

সন্ধ্যাবেলা স্বাতীর আসার কথা। লিলি অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করছে। সন্ধ্যার পর থেকে বাবা বাসায় থাকবেন। তিনি ব্যাপারটা কিভাবে দেখবেন কে জানে। মেয়েদের বন্ধু বান্ধবদের বাড়িতে বেড়াতে আসা তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করেন। সন্ধ্যার পর কেউ আসবে এটা বোধ হয় তাঁর স্বপ্নেও নেই। সম্ভাবনা খুব বেশি যে স্বাতীকে দেখে তিনি রেগে যাবেন। সভ্য মানুষ মনের রাগ চেপে রেখে হাসি মুখে কথা বলে। নেয়ামত সাহেব তা পারেন না। পারার কোন প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন না।

লিলি কলেজে পড়ার সময় তার এক বান্ধবী বিকেলে বেড়াতে এসেছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত সে থেকে গেল। হাসি মুখে খুব গল্প করছে তখন বিনা নোটিশে নেয়ামত সাহেব তাদের ঘরে ঢুকে পড়লেন। থমথমে গলায় বললেন, 'সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে বাসায় যাচ্ছ না কেন খুকি? সন্ধ্যাবেলা পাখির মত সামান্য প্রাণীও ঘরে ফেরে। তুমি এখানে বসে আছ কেন?' লিলির বান্ধবী আর কোনদিন তাদের বাড়িতে আসেনি। এই ঘটনার পর সে লিলিকে পর্যন্ত অপছন্দ করত।

স্বাতী এলে সহজে যাবে না। রাত নয়টা দশটা পর্যন্ত থাকবে। সম্ভাবনা খুব বেশি যে রাত দশটার সময় সে বলবে, লিলি রাতটা তোর সঙ্গে থেকে যাই। সারা রাত জমিয়ে গল্প করব। লিলির আলাদা ঘর আছে ঠিকই- কিন্তু রাতে সে একা ঘুমায় না। নেয়ামত সাহেব কোন মেয়েকে একা রাখতে রাজি না। ফরিদা রাতে লিলির সঙ্গে ঘুমুতে আসেন। লিলির সেটা খারাপ লাগে না। ভালই লাগে। সে অনেক রাত পর্যন্ত মা'র সঙ্গে গল্প করে। ভয়াবহ অস্বস্তির ব্যাপার হয় তখন যখন মাঝ রাতে বাবা এসে দরজায় টোকা দিয়ে গম্ভীর গলায় ডাকেন- ফরিদা, এই এই।

ফরিদা সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় উঠে বসেন- লিলি ঘুমাচ্ছে কি না তা দেখেন। লিলি গভীর ঘুমের ভান করে। ফরিদা লজ্জিত ভঙ্গিতে উঠে যান। আধ ঘন্টার মত সময় পার করে আবার ঘুমুতে আসেন। ফিরে এসেও লিলি ঘুমুচ্ছে কি না পরীক্ষা করার জন্যে দু'এক বার নরম গলায় ডাকেন লিলি, লিলি। লিলি ঘুমুচ্ছে নিশ্চিত হবার পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

মাঝরাতে মা'র উঠে যাবার এই ভয়াবহ অস্বস্তিকর সমস্যা থেকে লিলি অবশ্যি এখন মুক্ত হয়েছে। রুমু ঝুমুকে আলাদা রাখার ব্যবস্থায় নতুন নিয়মে রুমু এখন লিলির সঙ্গে ঘুমায়। ফরিদা ঘুমান ঝুমুর সঙ্গে। লিলির অস্বস্তিকর মুহূর্ত এখন নিশ্চয়ই ঝুমু ভোগ করে। কিভাবে কে জানে। লিলি ভেবে পায় না, মানুষ এত অবিবেচক হয় কি করে?

স্বাতী এল রাত আটটার দিকে। সেজে গুজে একেবারে পরী হয়ে এসেছে। ঘরে ঢুকেই সে বলল, 'তোরা ভাত খাস কখন? আমি আজ রাতে তোদের সঙ্গে খাব।'

লিলির হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। যে সব নাটক হয় তাদের খাবার টেবিলে, বাইরের কাউকে নিয়ে খেতে বসার প্রশ্নই আসে না।

নেয়ামত সাহেব দোতলার বারান্দায় রাখা জলচৌকিতে বসে তসবি পড়ছিলেন। তিনি সেখান থেকেই গম্ভীর গলায় বললেন, 'ফরিদা কে আসল? এত রাতে আসল কে?'

লিলির মুখ শুকিয়ে গেল। লিলি করুণ চোখে মা'র দিকে তাকাল। যে তাকানোর অর্থ- মা আমাকে বাঁচাও। ফরিদা তৎক্ষণাৎ দোতলায় উঠে গেলেন। লিলি মা'র উপর তেমন ভরসা করতে পারছে না। স্ত্রীর কথায় প্রভাবিত হবার মানুষ নেয়ামত সাহেব না।

স্বাতী বলল, 'চল তোর বাবার সঙ্গে আগে দেখা করে আসি।'

লিলি ক্ষীণ স্বরে বলল, 'বাবার সঙ্গে দেখা করার দরকার নেই। বাবা তসবি পড়ছেন এখন গেলে বিরক্ত হবেন।'

'বিরক্ত হবেন না, আয় তো।'

স্বাতী তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। লিলিকে বাধ্য হয়ে তার পেছনে পেছনে যেতে হচ্ছে। বারান্দায় বাতি জ্বলছে। নেয়ামত সাহেব জলচৌকির উপর বসে আছেন। হাতে তসবি। লুঙ্গি পরা খালি গায়ের একটা মানুষ, মাথায় আবার টুপি।

স্বাতী নিচু হয়ে কদমবুসি করল, নরম গলায় বলল, 'চাচা ভাল আছেন?'

নেয়ামত সাহেব একটু হকচকিয়ে গেলেন। কদমবুসির জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

'আমাকে বোধ হয় চিনতে পারছেন না। আমি লিলির বন্ধু। আমার নাম স্বাতী। আগেও কয়েকবার এসেছি। আপনি বোধ হয় মনে করতে পারছেন না।'

'ও আচ্ছা।'

'আমিও অবশ্যি ইচ্ছে করে আপনার কাছ থেকে দূরে দূরে থেকেছি। আপনাকে যা ভয় লাগে। লিলি আপনাকে যতটা ভয় পায় আমিও ততটা পাই।'

নেয়ামত সাহেব খুশি হলেন। তবে খুশি প্রকাশ করলেন না। খুশি যে হয়েছেন তা বোঝা গেল তাঁর পা নাড়া দেখে। খুশির কোন ব্যাপার হলে তিনি পা নাচান। স্বাতী বলল, 'চাচা আপনার কাছে আমি একটা নালিশ করতে এসেছি। লিলির বিরুদ্ধে কঠিন একটা নালিশ। আপনি আজ বিচার করে দেবেন।'

নেয়ামত সাহেব পা নাচানো বন্ধ করে শীতল গলায় বললেন, 'কি ব্যাপার?'

'আমি তো দেশের বাইরে চলে যাব। আর ফিরব না। যাবার আগে আমি আমার সব বান্ধবীর বাসায় এক রাত করে থাকব বলে ঠিক করেছি। অনেকের সঙ্গে থেকেছি, সারা রাত গল্প করেছি। লিলি শুধু বাদ। ও কিছুতেই রাতে আমাকে থাকতে দেবে না।'

'সারারাত জেগে গল্প করার দরকার কি? শরীর নষ্ট। দিনে গল্প করলেই হয়।'

'না চাচা, রাতের গল্পের আলাদা আনন্দ- আপনি লিলিকে একটু বলে দিন। আজ আমি থাকব। মন ঠিক করে এসেছি।'

'তোমার বাবা-মা চিন্তা করবে।'

'তাদের বলে এসেছি। কিন্তু আপনি লিলিকে কড়া করে ধমক না দিলে ও রাখবে না।'

নেয়ামত সাহেব বিরক্ত চোখে ফরিদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি সংসারের কাজ কর্ম ফেলে শুধু শুধু এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

ফরিদা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে চলে যাচ্ছেন। লজ্জায় লিলির মরে যেতে ইচ্ছা করছে। সে এখন নিশ্চিত যে বাবা স্বাতীকে বলবেন, নিজের বাড়ি ঘর ফেলে অন্যের বাড়িতে থাকা তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করেন।

নেয়ামত সাহেব হাত থেকে তসবি নামিয়ে রাখতে রাখতে স্বাতীর দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বললেন, 'তোমাদের বাসায় টেলিফোন আছে?'

'জ্বি চাচা, আছে।'

'লিলি টেলিফোনটা আন। আমি টেলিফোনে তার বাবার অনুমতি নিয়ে নেই।'

'আমি অনুমতি নিয়েই এসেছি চাচা।'

নেয়ামত সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, 'তুমি নিয়েছ সেটা তোমার ব্যাপার। আমি তো নেই নাই। টেলিফোন নাম্বার কত?'

'৮৬৫৬০০, এখন টেলিফোন করলে পাবেন না চাচা। বাবা-মা এক বিয়েতে গেছেন। ফিরতে ফিরতে রাত দশটা বাজবে।'

'যে বাড়িতে গেছেন তাদের টেলিফোন নাই?'

'জ্বি আছে।'

'দাও, ঐ নাম্বারটা দাও।'

স্বাতী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

নেয়ামত সাহেব টেলিফোন করলেন। বিয়ে বাড়ির ভয়াবহ হাঙ্গামার ভেতরও স্বাতীর বাবা নাজমুল সাহেবকে টেলিফোনে ধরলেন। কথা বললেন। নেয়ামত সাহেব টেলিফোন নামিয়ে শুকনো মুখে বললেন, 'তোমার বাবা থাকার অনুমতি দিয়েছেন। থাক।'

লিলি স্বাতীকে নিয়ে দ্রুত তার বাবার সামনে থেকে সরে এল। বড় চাচার ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি ডাকলেন- 'কে যাচ্ছে লিলি নাকি, শুনে যা তো।' লিলি দাঁড়াল না, চট করে সরে গেল।

স্বাতী বলল, 'তুই তো কঠিন এক বাড়িতে বাস করছিস।'

লিলি বলল, 'হুঁ।'

'আমার এত ঠাণ্ডা মাথা। সেই মাথাও তোর বাবা প্রায় এলোমেলো করে ফেলেছিলেন। তবে আমিও বাঘা তেতুল। থাকার অনুমতি আদায় করে ছাড়লাম।'

'হুঁ।'

'হুঁ হুঁ করিস না। প্রাণ খুলে গল্প কর। তোরা ভাত কখন খাস?'

'একেক জন একেক সময়। ধরা বাঁধা কিছু নেই।'

'তাহলে তো সুবিধাই হল। আমরা দু'জন রাত বারোটার দিকে চুপি চুপি এসে খেয়ে চলে যাব। সারা রাত গল্প চলবে। ফ্লাক্স ভর্তি চা বানিয়ে রাখব। ঘুম পেলে চা খাব, সিগারেট খাব।'

'সিগারেট খাবি মানে?'

'আকাশ থেকে পড়ার মত ভঙ্গি করবি না। সিগারেট এক প্যাকেট নিয়ে এসেছি। মেয়েদের জন্যে বানান স্পেশাল আমেরিকান সিগারেট। নাম হচ্ছে সিল্ক কাট। তামাক নেই বললেই হয়। আচ্ছা শোন, তোদের বাসার ছাদটা কেমন, ভাল?'

'হুঁ।'

'তাহলে ছাদে বসে গল্প করব। চাদর থাকবে। বালিশ থাকবে, মশার কয়েল জ্বলন্ত থাকবে। আমরা আকাশের তারা দেখতে দেখতে গল্প করব। তুই কি কখনো আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে গল্প করেছিস?'

'না।'

'দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হয়। ধর দু'জনে মিলে ছাদে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে গল্প করছিস। তারা ঝিলমিল করছে। হঠাৎ দেখবি তারাগুলি আকাশ থেকে নেমে চোখের

সামনে চলে এসেছে। এত কাছে যে ইচ্ছা করলে হাত দিয়ে তারাদের ছোঁয়া যায়।'

লিলি অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'তুই কার সঙ্গে শুয়ে তারা দেখেছিলি?'

স্বাতী হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, 'তুই যা ভাবছিস তাই।'

'কতক্ষণ তারা দেখেছিলি?'

'এত ইন্টারেস্টিং লাগছিল যে সারারাতই দেখলাম। খালার বাসায় যাবার কথা বলে ওর ওখানে চলে গিয়েছিলাম। তারপর কাণ্ড কি হয়েছে শোন, ভোর রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ জেগে উঠে দেখি খুব বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা দু'জনে বৃষ্টিতে মাখামাখি। হি হি হি।'

লিলির গা কাঁটা দিয়ে উঠল– 'কি সর্বনাশের কথা!'

স্বাতী বলল, 'আমাকে তোর ঘরে নিয়ে চল। বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব। রাত জাগার জন্যে ব্যাটারী চার্জ করে নিতে হবে। গত দু'রাতেও ঘুমুইনি। আমাকে দেখে কি সেটা বোঝা যাচ্ছে?'

'তোকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না।'

'ঠিক বলেছিস। আমি হলাম বরফের মত, বারো ভাগের এগারো অংশই পানির নীচে, এক অংশ উপরে।'

লিলি স্বাতীকে তার ঘরে নিয়ে গেল। স্বাতী আসবে এই ভেবে ঘর কিছুটা গোছানো ছিল। তারপরেও কি বিশ্রী দেখাচ্ছে। কতদিন দেয়ালে চুনকাম হয় না। উত্তর দিকের দেয়ালে নোনা ধরেছে। প্লাস্টার খসে খসে পড়ছে। খাটের নীচে রাজ্যের ট্রাংক, এলুমিনিয়ামের বড় বড় ডেগচি– যেগুলি প্রতি বছর একবার কোরবানীর ঈদে বের হয়।

খাটের পাশে ড্রেসিং টেবিল একটা আছে– যার আয়না নষ্ট হয়ে গেছে। চেহারা খানিকটা দেখা যায়, খানিকটা দেখা যায় না। ড্রেসিং টেবিলের সঙ্গেই লিলির পড়ার টেবিল। পড়ার টেবিলে বইপত্রের সঙ্গে এক কোণায় শ্যাম্পুর বোতল, ক্রীমের কৌটা, চিরুনি। স্বাতী এই ঘরে রাত কাটাবে ভাবতেই কেমন লাগে। স্বাতীর নিজের ঘর ছবির মত গোছানো। কে জানে হয়ত ছবির চেয়েও সুন্দর।

স্বাতীর ঘরের তিন দিকের দেয়াল দুধের মত সাদা, একদিকের দেয়ালে নীল রঙ। সেই দেয়ালে পেইন্টিং ঝুলছে। নিচু একটা খাট। খাটটার পায়ের কাছে ছোট বার ইঞ্চি রঙীন টিভি। পুরো দেয়াল ঘেঁষে মিউজিক সেন্টার সাজানো। সেখানে মনে হয় দিন রাতই গান বাজে। লিলি যতবারই ঘরে ঢুকেছে ততবারই শুনেছে গান হচ্ছে। ঘরের মেঝে দেয়ালের মতই ধবধবে সাদা। সেই সাদার উপর ছোট্ট নীল রঙের সাইড কার্পেট। ঘরের এক কোণায় একটা পড়ার টেবিল আছে। কাইবার পলিশ করা কাঠের চেয়ার টেবিল– দেয়ালের রঙের সাথে মেলানো।

সবচে সুন্দর স্বাতীর বাথরুম। যেন আলাদা একটা জগৎ। গোল বাথটাব লিলি স্বাতীর বাথরুমেই প্রথম দেখে। যেন ঘরের ভেতর ছোট্ট দীঘি। বাথটাবের ভেতরটা নীল রঙ করা বলেই পানি দিয়ে ভর্তি করলে পানিটাকে নীল দেখায়।

যে স্বাতী এ রকম জায়গায় থেকে অভ্যস্ত সে লিলির ঘরে ঘুমুবে কি করে। তারচে ছাদে সারারাত জেগে থাকাই ভাল। স্বাতী অবশ্যি লিলির ঘরে ঢুকে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তোর খাটটা তো বিরাট, হাত ছড়িয়ে শোয়া যায়। আমি শুয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ব। তুই বাতি নিভিয়ে চলে যাবি। আমাকে ডেকে তুলবি ঠিক বারোটায়। তখন ভাত খেয়ে গল্প শুরু করব।'

স্বাতী জুতা খুলে বিছানায় উঠে পড়ল। সহজ গলায় বলল, 'পাতলা একটা চাদর আমার গায়ে দিয়ে দে, ঘুমে চোখের পাতা মেলে রাখতে পারছি না।'

লিলি তার ঘরের বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে বের হয়েছে। তার কাছে মনে হচ্ছে এখন তার আর কিছু করার নেই। রাত বারোটা না বাজা পর্যন্ত তাকে অস্বস্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। ছাদে গিয়ে একবার ছাদটা দেখে আসা দরকার। তার মনে হচ্ছে ছাদে রাজ্যের ময়লা। বুয়াকে নিয়ে একটু বোধ হয় পরিষ্কার করে রাখা দরকার। লিলি ছাদে উঠল।

ছাদের চিলেকোঠার ঘরে বাতি জ্বলছে। লিলির ছোট চাচা জাহেদুর রহমান এই সময় ঘরে ফেরে না। আজ ফিরেছে। ছোট চাচার ঘরটা আজ রাতের মত নিয়ে নিতে পারলে খুব ভাল হত, এই ঘরটা সুন্দর। স্বাতী এই ঘরে অস্বস্তি বোধ করবে না। তা ছাড়া এই ঘরে থাকলে যখন ইচ্ছা করবে তখন ছাদে আসা যাবে। লিলি খোলা দরজা ধরে দাঁড়াল। জাহেদ লিলির দিকে না তাকিয়েই বলল, 'কি খবর মাই ডিয়ার লিলি বেগম। হার এক্সেলেন্সি।'

'খবর ভাল ছোট চাচা। তুমি আজ সকাল সকাল ফিরলে যে। এগারোটা বারোটার আগে তো কখনো ফের না।'

'একদিন ফিরে দেখলাম কেমন লাগে। আয়, ভেতরে আয়। তোকে তো কখনো সন্ধ্যার পর ছাদে দেখা যায় না। আজ কি মনে করে?'

'তোমার কাছে একটা আবেদন নিয়ে এসেছি, ছোট চাচা।'

'আবেদন গ্রান্টেড।'

'না শুনেই গ্রান্ট করে দিলে?'

'হুঁ। আজ আমার মনটা ভাল। এই জন্যেই পেয়ে গেলি।'

'মন ভাল কেন?'

'এখন বলব না। যথাসময়ে বলব। আবেদনটা কি?'

'আমার এক বান্ধবী এসেছে রাতে আমার সঙ্গে থাকবে। তুমি কি আজ রাতে তোমার ঘরটা আমাদের ছেড়ে দেবে।'

'একি! তুই দেখি রাজত্ব চেয়ে ফেললি। ঘরটাই আমার রাজত্ব।'

'শুধু এক রাতের জন্য চেয়েছি।'

'নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোন ঘরে আমার এক ফোঁটা ঘুম হয় না। যাই হোক বেকুবের মত আগেই যখন গ্রান্টেড বলে দিয়েছি তখন গ্রান্টেড। এক্ষুণি ঘর ছেড়ে দিচ্ছি।'

'রাত বারটার সময় ছাড়লেই হবে। ছোট চাচা, থ্যাংক য়্যু। তুমি এবারে অবশ্যই আমেরিকার ভিসা পাবে। আমি সত্যি সত্যি তোমার জন্যে দোয়া করব।'

জাহেদুর রহমান বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল, 'ড্রয়ারে হাত দিবি না। টেবিলের উপর কাগজপত্র আছে, ঘাঁটাঘাটি করবি না।'

'কোন কিছুতেই আমরা হাত দেব না।'

'গুড।'

রাত একটার দিকে লিলি স্বাতীকে নিয়ে ছাদে এল। চিলেকোঠার কাছে এসে স্বাতী থমকে দাঁড়াল। অবাক হয়ে বলল, 'তোদের ছাদের এই ঘরটা তো সুন্দর রে। কে থাকে এখানে?'

'আমার ছোট চাচা।'

'বাহ্, ঘরটাও তো খুব গোছানো। শুধু একটাই সমস্যা, ব্যাচেলার ব্যাচেলার গন্ধ।'

'লিলি বলল, 'রাতে আমরা এই ঘরে ঘুমুব।'

স্বাতী বলল, 'ঘুমুবার জন্যে তোর এখানে এসেছি না–কি? ঘুমুব না। আমার যা ঘুমানোর ঘুমিয়ে ফেলেছি। ছাদে বিছানা করতে বলেছিলাম, করিসনি?'

'করেছি। ঐ কোণায়।'

'বাহ্ সুন্দর তো। অসাধারণ।'

'একটা শীতল পাটি বিছিয়েছি শুধু। অসাধারণের কি?'

'এইটাই অসাধারণ। ছাদের উপর শীতল পাটি মানায়, গদীর বিছানা মানায় না। বালিশ কোথায়?'

'ছোট চাচার ঘর থেকে নিয়ে আসছি।'

'উহুঁ–ব্যাচেলার গন্ধওয়ালা বালিশে আমি ঘুমুব না। তুই তোর ঘর থেকে বালিশ নিয়ে আয়। ফ্লাক্সভর্তি করে চা আনতে বলেছিলাম, এনেছিস?'

'আমাদের ফ্লাক্স নেই।'

'বলিস কি, তোদের ফ্লাক্স নেই?'

লিলি হালকা গলায় বলল, 'আমাদের কিছুই নেই।'

'চা ছাড়া সারারাত জাগব কিভাবে?'

'তোর যখন চা খেতে ইচ্ছা করবে বলবি, ছোট চাচার ঘরে ওয়াটার হীটার আছে, টি ব্যাগ আছে। চা বানিয়ে দেব।'

'দেশলাই আনবি। সিগারেট খেতে হবে। তুই আবার না না করে ঢং করতে পারবি না। তুইও খাবি।'

লিলি এবং স্বাতী পাটিতে শুয়ে আছে। মাথার উপর তারা ভরা আকাশ। স্বাতী বলল, 'তারাগুলির দিকে তাকিয়ে থাকবি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না, সাধারণভাবে। তারার দিকে তাকিয়ে গল্প করতে থাকবি।'

'কি গল্প?'

'যা মনে আসে।'

লিলি বলল, 'তুই আমার গল্প শোনার জন্যে এত যন্ত্রণা করে আমার সঙ্গে শোয়ার ব্যবস্থা করেছিস তা কি ঠিক? তুই এসেছিস তোর গল্প বলার জন্যে। কি বলতে চাস বল, আমি শুনছি।'

স্বাতী নিচু গলায় বলল, 'হাসনাতকে যখন বললি আমি আসব না তখন সে কি বলল?'

'টেলিফোনে তো একবার বলেছি।'

'আবার বল। টেলিফোনে কি বলেছিস আমার মনে নেই।'

'উনি কিছুই বলেননি।'

'কিছুই না?'

'না।'

'ভাল করে ভেবে বল। হয়ত কিছু বলেছে।'

'বলেছেন– 'ও আচ্ছা।'

'সেই 'ও আচ্ছাটা' কি ভাবে বলল? 'ও আচ্ছা' বাক্যটা অনেক ভাবে বলা যায়। হাই–

ড্রামা করে বলা যায়, গভীর বিষাদের সঙ্গে বলা যায়, রাগের সঙ্গে বলা যায়। কি ভাবে বলল?'

'খুব সাধারণ ভাবে বলেছেন।'

স্বাতী নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার ধারণা ওর মধ্যে ড্রামা কম। আবেগ আছে– তবে তা আইসবার্গের মত। চোখে পড়ে না।'

লিলি শান্ত গলায় বলল, 'একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশলি, সারারাত জেগে তারা দেখলি, বিয়ে ঠিক ঠাক করলি, তারপর হুট করে সব ভেঙে দিলি?'

স্বাতী বলল, 'আমার চায়ের পিপাসা হচ্ছে।'

'তুই আমার প্রশ্নের জবাব দিসনি।'

'প্রশ্ন কোথায়? প্রশ্ন না করলে জবাব দেব কি? বল, তোর প্রশ্ন বল।'

'বিয়ে সত্যি সত্যি পুরোপুরি ভেঙে গেছে?'

'হুঁ।'

'কেন?'

'আমি ঠিক যে রকম মানুষ চাচ্ছি সেরকম মানুষ ও না।'

'তুই কি রকম মানুষ চাচ্ছিস?'

'ব্যাখ্যা করতে পারব না।'

'উনি যে সেরকম মানুষ না সেটা বুঝলি কি করে? মানুষের বুঝতেও তো সময় লাগে।'

'তাকে সময় দিয়েছি। এত ঘনিষ্ঠভাবে তার সঙ্গে যে মিশলাম, কেন মিশলাম? তাকে ভাল মত জানার জন্যেই মিশলাম। লিলি চা খাব।'

লিলি চা বানানোর জন্যে উঠে গেল। স্বাতী শুয়ে শুয়ে তারা দেখছে। ঐ রাতের মত হচ্ছে না, তারাগুলি ঝট করে চোখের উপর নেমে আসছে না। কে জানে আকাশের তারা নামানোর জন্যে একজন প্রেমিক পুরুষ হয়ত দরকার হয়।

লিলি চা নিয়ে এসেছে। স্বাতী উঠে বসতে বসতে বলল, 'দেশলাই এনেছিস?'

লিলি দেশলাই সামনে রাখল।

স্বাতী বলল, 'তুই দেশলাইটা এমনভাবে ছুঁড়ে ফেললি যেন আমি দেশলাই দিয়ে ভয়ংকর কোন পাপ করতে যাচ্ছি। তা কিন্তু করছি না। আমি অতি নিরীহ একটা গিফ্ট কাট সিগারেটে আগুন দিয়ে পুড়াব। তুইও পুড়াবি।'

'আমি না।'

'আচ্ছা লিলি, তোর মধ্যে কি কৌতূহল বলে কিছু নেই? এই যে হাজার হাজার ছেলে, বুড়ো, জোয়ান, ধুমসে সিগারেট খাচ্ছে, কায়দা করে ধোঁয়া ছাড়ছে– ব্যাপারটা কি একবার জানারও ইচ্ছা হয় না?'

'না।'

'এই যে আমি সিগারেট টানছি, আমাকে দেখেও ইচ্ছা হচ্ছে না?'

'না।'

'থাক তাহলে, জোর করব না। খুব মানসিক চাপের মধ্যে আছি। ভেবেছিলাম তোর সঙ্গে রাত জেগে, হৈ চৈ করে, সিগারেট টেনে চাপটা কমাব। তোর কাছে আসার লাভের মধ্যে লাভ এই হয়েছে মনের চাপটা বেড়েছে। তুই তোর সুন্দর মুখ শ্বেত পাথরের মূর্তির মুখের মত করে রেখেছিস। আমার সঙ্গে এরকম আচরণ করছিস যেন আমি সিন্দাবাদের ভূত হয়ে তোর ঘাড়ে

চেপে আছি। শুনুন ইয়াং লেডি, আমি কোন সিন্দাবাদের ভূত না। আমি কারোর ঘাড়ে চাপি না।'

'তোর চাপটা কি জন্যে? বিয়ে ভেঙে দেয়ার জন্যে?'

'না। ওর কাছে আমার একটা পেইনটিং আছে। পেইনটিংটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে।'

লিলি ভীত গলায় বলল, 'কি রকম পেইনটিং?'

'বুঝতেই তো পারছিস কি রকম।'

'বুঝতে পারছি না।'

বাতী সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'নুড স্টাডি।'

'সেটা আবার কি?'

'ন্যাকামী করিস না তো লিলি। ন্যাকামী আমার অসহ্য লাগে। নুড স্টাডি কি তুই সত্যি জানিস না?'

'না।'

'ছবিটার নাম মধ্যাহ্ন। ছবিটা হচ্ছে এরকম– আমি উপুড় হয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছি– খুব মন দিয়ে পড়ছি। আমার মাথার চুলে বইটার একটা পাতা ঢাকা। আর আমার গায়ে কোন কাপড় নেই।'

লিলি আতংকিত গলায় বলল, 'গায়ে কাপড় নেই মানে কি?'

'কাপড় নেই মানে কাপড় নেই।'

'এ রকম ছবি আঁকার মানে কি?'

বাতী দ্বিতীয় সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল– 'খালি বাড়ি, খাঁ খাঁ দুপুর। একটি তরুণী মেয়ের নগ্ন হয়ে বই পড়তে ইচ্ছা হয়েছে, সে বই পড়ছে। আর্টিস্ট সেই ছবি এঁকেছেন।'

'কোন মেয়ের এ রকম নগ্ন হয়ে বই পড়ার অদ্ভুত ইচ্ছা হবে কেন?'

বাতী বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোর সঙ্গে ছবি নিয়ে আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। চুপ করে থাক।'

লিলি বলল, 'ঐ ছবির জন্যে তোর দুশ্চিন্তা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। ছবিটা এত সুন্দর হয়েছে আমার ধারণা শিল্পকলা একাডেমীতে ওর যে সলো এক্সিবিশন হবার কথা সেখানে ছবিটা থাকবে। হাজার হাজার মানুষ আমাকে নগ্ন দেখবে।'

'তোর অসম্মান হবে এরকম কাজ উনি কখনো করবেন না।'

'ও করবে। লেখক, কবি, শিল্পী এদের কাছে সৃষ্টিটাই প্রধান। সৃষ্টির পেছনের মানুষটা প্রধান না। আমার সম্মান হবে না অসম্মান হবে তা সে দেখবে না। সে দেখবে তার ছবি সুন্দর হয়েছে। ছবিটা অন্যদের দেখান দরকার।'

'এখন তাহলে কি করবি?'

'আমি কিছু করব না। যা করার তুই করবি। তুই তার সঙ্গে কথা বলে ছবিটা নিয়ে আসবি।'

'আমি?'

'হ্যাঁ। তুই। তুই ছাড়া এইসব কথা আমি কি আর কাউকে বলতে পারি? দু'জনের মধ্যে যখন সমস্যা হয় তখন সমস্যা সমাধানের জন্যে একজন মিডল ম্যান লাগে। তুই সেই মিডল ম্যান। নে, ফাঁসির আসামির মত চেহারা করবি না।'

'আমি একা একা ঐ বাড়িতে যাব?'

'হ্যাঁ, ও বাঘ ভালুক না। তোকে খেয়ে ফেলবে না।'

'আমাকে খুন করে ফেললেও আমি যাব না।'

'আচ্ছা বেশ। না গেলে না যাবি। নে সিগারেট খা। এখনো যদি না বলিস– আমি কিন্তু তোকে ধাক্কা দিয়ে ছাদ থেকে নীচে ফেলে দেব।'

লিলি কিছু বলল না। বাতী বলল, 'আয় আকাশের তারা দেখতে দেখতে গল্প করি। বিপদ হয়েছে আমার– আর তুই ভয়ে এত অস্থির হয়ে পড়েছিস কেন?'

লিলি তার বান্ধবীকে নিয়ে ছাদে কি করছে এটা দেখার জন্য নেয়ামত সাহেব রাত তিনটার দিকে ছাদে এলেন। তিনি দেখলেন দু'জন পাটি পেতে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছে। দু'জনের হাতেই জ্বলন্ত সিগারেট।

……

লিলির ঘুম ভাঙলো সকাল দশটায়।

তার সারা গায়ে রোদ। সে কোথায় ঘুমুচ্ছে? ছাদে? লিলি ধড়মড় করে উঠে বসল। টেনশনের সময় তার সব এলোমেলো হয়ে যায়। তার আজ এসএসসি পরীক্ষা না? জেনারেল ম্যাথ। কি সর্বনাশ, কেউ তাকে ডেকে দেয়নি কেন? প্রায় লাফিয়ে বিছানা থেকে নামতে গিয়ে মনে হল– এসএসসি পরীক্ষার ঝামেলা অনেক আগে শেষ হয়েছে। এবং সে ছাদে না, নিজের ঘরে নিজের বিছানাতেই ঘুমুচ্ছিল।

শাহী এবং সে দু'জনই ঘুমুচ্ছিল। শাহী নেই। সে কি চলে গেছে নাকি?

লিলি বারান্দায় এসে দেখে ফরিদা বারান্দার রেলিং–এ ভেজা কাপড় মেলে দিচ্ছেন। তাঁর মুখ ভাবলেশহীন। লিলিকে দেখেও তিনি কিছু বললেন না।

'শাহী কোথায় মা?'

'চলে গেছে।'

'কখন চলে গেল?'

'সকালে চলে গেছে। তুই ঘুমুচ্ছিলি বলে ডাকেনি।'

'আজ কি বার মা?'

'জানি না কি বার।'

'কি সর্বনাশ আজ তো বৃহস্পতিবার, এগারোটার সময় টিউটোরিয়াল আছে। তাড়াতাড়ি নাশতা দাও মা।'

ফরিদার ভেতর কোন তাড়া দেখা গেল না। তিনি যেমন ভেজা কাপড় মেলছিলেন ঠিক তেমনি মেলতে থাকলেন। লিলি অতি দ্রুত হাত মুখ ধুয়ে নীচে নেমে এল। রুটি ভাজি টেবিলে থাকবে। খেয়ে চলে গেলেই হবে।

'বুয়া খুব তাড়াতাড়ি চা দাও।'

আটার রুটি শক্ত চামড়ার মত হয়ে আছে। ছেঁড়া যাচ্ছে না। ভাজিতে আজ কোন লবণ নেই। লবণ সম্ভবত দেয়াই হয়নি। ফরিদা খাবার ঘরে ঢুকলেন। লিলি বলল, 'শাহী কি সকালে কিছু খেয়ে গিয়েছে মা?'

'চা খেয়েছে।'

'তুমি কিছু খেয়েছ?'

'হাতের কাজই শেষ হয়নি। খাব কি?'

ফরিদা বসলেন। নাশতা খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কোন আগ্রহ দেখা গেল না। লিলি বলল, 'বৃহস্পতিবারের ক্লাসটায় আমি রোজ লেট করি। আজও লেট হবে।'

ফরিদা বললেন, 'তোর বাবা বলেছে তোকে ইউনিভার্সিটিতে না যেতে।'

'কখন বলল?'

'অফিসে যাবার আগে বলে গেল।'

লিলি অবাক হয়ে বলল, 'ইউনিভার্সিটিতে যাব না কেন?'

'তোর বাবা খুব রাগারাগি করছিল। তুই না–কি কাল রাতে ছাদে সিগারেট খাচ্ছিলি? তোর বাবা দেখেছে। তুই আর ঐ মেয়ে শুয়ে শুয়ে সমানে সিগারেট টানছিস।'

লিলির হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল। রুটি এবং ভাজি গলায় আটকে যাবার মত হল।

'তোর বাবা তোকে কিছু বলেনি, আমার সঙ্গে রাগারাগি। মাথায় রক্ত উঠে গেছে, ধাক্কা দিয়ে আমাকে ফেলে দিল।'

'তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলল কেন? তুমি কি করেছ?'

'রাগলে কি আর মাথার ঠিক থাকে? কে কি করে এই সব মনে থাকে না। যে সামনে থাকে রাগ গিয়ে পড়ে তার উপর।'

'শাহীকে বাবা কিছু বলেনি তো?'

'উহুঁ। আল্লাহ্‌র কাছে হাজার শুকুর বাইরের মেয়ের সামনে ইজ্জত রক্ষা হয়েছে। তুই সিগারেট খাচ্ছিলি কেন?'

'মজা করার জন্যে খেয়েছি মা।'

'বাথরুমে দরজা বন্ধ করে খেলেই হত। এখন কি যন্ত্রণার মধ্যে ফেললি দেখ তো।'

'আমার ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া তাহলে বন্ধ?'

'হুঁ।'

'আমি কি করব? দিনরাত ঘরে বসে থাকব?'

ফরিদা হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'তোর বাবা বলছিল তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করবে।'

মতির মা বুয়া চা দিয়ে গেছে। লিলির চা খেতে ইচ্ছা করছে না। ফরিদা বললেন, 'তুই ঝুমুকে আজ আবার একটু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবি? ওর ঠোঁট ফুলে কি হয়েছে। মুখটা হাঁসের মত হয়ে গেছে।' বলেই ফরিদা হাসতে শুরু করলেন।

লিলি এক দৃষ্টিতে মাকে দেখছে। কি অদ্ভুত মহিলা, তার এক মেয়ের ইউনিভার্সিটিতে পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। তাতে কোন বিকার নেই। যেন এটাই স্বাভাবিক। ঝুমুর ঠোঁট ফুলে হাঁসের মত হয়ে গেছে, এটাই তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করছে।

'চা ঠান্ডা হচ্ছে তো, খেয়ে ফেল।'

'খেতে ইচ্ছা করছে না।'

'না খেলে তোর বড় চাচাকে দিয়ে আয়। চা চেয়েছিল দিতে ভুলে গেছি।'

লিলি কাপ হাতে উঠে গেল। আজহার উদ্দিন খাঁ খবরের কাগজ পড়ছিলেন। লিলিকে ঢুকতে দেখে কাগজ ভাঁজ করে রাখলেন। চোখের চশমা খুলে ফেলে গম্ভীর গলায় বললেন, 'লিলি তুই না–কি কাল সারারাত ছাদে ধূমপান করেছিস?'

লিলি চুপ করে রইল।

'সকালে নিয়মিত আমাকে বলল। এই ঘটনা বিশ্বাস করা কঠিন। আমি তাকে নিয়ে ছাদে গেলাম। নয়টা সিগারেটের টুকরা পেয়েছি। তোর কিছু বলার আছে লিলি?'

'না।'

'বোস এখানে। অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ বলে যে কথা আছে সেটাই হয়েছে। অসৎ সঙ্গে তোর সর্বনাশ হয়েছে। তুই এটা বুঝতে পারছিস না। মেয়েটার নাম কি?'

'কোন মেয়েটার?'

'তোকে যে ট্রেনিং দিচ্ছে। সিগারেট মদ এইসব ধরাচ্ছে।'

'মদের কথা আসছে কেন চাচা?'

'একটা যখন এসেছে অন্যটাও আসবে। কানের সাথেই মাথা আসে। কান আর মাথা তো আলাদা না। মেয়েটার নাম কি?'

'স্বাতী।'

'ওর সঙ্গ বিষ বৎ পরিত্যাগ করবি। অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করা যদিও খুব কঠিন। মন্দ জিনিসের আকর্ষণী ক্ষমতা থাকে প্রবল।'

'চাচা আমার কি তাহলে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া বন্ধ?'

'হ্যাঁ বন্ধ। তবে সাময়িকভাবে বন্ধ। তোর বাবাকে বলেছি দ্রুত তোর বিয়ের ব্যবস্থা করতে। বিয়ে হয়ে যাক। তারপর তোর স্বামী যদি মনে করে তোর পড়াশোনা করা উচিত তাহলে আবার যাবি। তখন আর আমাদের কোন দায়িত্ব থাকবে না।'

লিলি তাকিয়ে আছে। আজহার উদ্দিন খাঁ আবার চশমা খুলে চোখে পরলেন। খবরের কাগজের ভাঁজ খুলতে খুলতে বললেন, 'অনেকক্ষণ আগে চা চেয়েছিলাম। চা দিচ্ছে না। ব্যাপার কি খোঁজ নিয়ে আয় তো।'

'চা আপনাকে দিয়েছি। আপনার সামনেই আছে।'

'ও আচ্ছা, থ্যাংকস। জানালার পাল্লাটা একটু খুলে দিয়ে যা। ভাল নিকেলটা।'

লিলি চাচার ঘর থেকে বের হল। সে এখন কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে। তাতে লাভ কি হবে?

বারান্দায় ঝুমু বসে আছে। লিলি তাকে দেখে আঁৎকে উঠল। তার ঠোঁট অনেকখানি ফুলেছে। ভয়ংকর দেখাচ্ছে, ঠিকই খানিকটা হাঁসের মত লাগছে।

'ব্যথা করছে ঝুমু?'

'হুঁ।'

'চল যাই, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। আমার পার্মিশানের দরকার নেই। স্যান্ডেল পরে আয়। ব্যথা কি খুব বেশি করছে?'

'হুঁ।'

'চা–নাশতা কিছু খেয়েছিস?'

'না।'

'যে অবস্থা– এই অবস্থায় কিছু খাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। তোকে দেখে তো আমারই ভয় লাগছে।'

ডাক্তার সাহেব ঠোঁট ড্রেসিং করে দিলেন। এন্টিবায়োটিক ইনজেকশনের কোর্স শুরু করতে বললেন। সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই. মুখের চামড়া খুব সেনসেটিভ তো অল্পতেই ফুলে যায়।'

রিকশায় ফেরার পথে ঝুমু বলল, 'আপা কাল রাতে তুমি সিগারেট খেয়েছিলে, তাই না?'

'হুঁ।'

'যা কান্ড সকালে হয়েছে। বাবা মা'র সঙ্গে রাগারাগি করল। ধাক্কা দিয়ে সিঁড়িতে ফেলে দিল, মা গড়াতে গড়াতে নীচে পড়েছে. শাড়িটাড়ি উল্টে বিশ্রী অবস্থা। পরনের শাড়ি একেবারে উঠে গিয়েছিল।'

'বলিস কি?'

'আমাদের স্যার কাজের বুয়া সবাই দেখেছে। মা খুব লজ্জা পেয়েছে।'

'লজ্জা পাবারই তো কথা।'

ঝুমু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'সিগারেট খেয়েছ ভাল করেছ। বাবার সামনে খেলে আরও ভাল হত।'

বাসার সামনে দু'বোন রিকশা থেকে নামল। লিলি বলল, 'ঝুমু তুই বাসায় চলে যা। আমি যাব না। আমি ইউনিভার্সিটিতে যাব।'

'বাবা তোমাকে ইউনিভার্সিটিতে যেতে নিষেধ করেছে।'

'করুক।'

'দু'টার আগে ফিরে আসবে। বাবা দু'টার সময় ফিরবে।'

'দেখি, তোর ব্যথা কি একটু কমেছে?'

'হুঁ।'

'মা'কে বলিস আমি ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি।'

'বই খাতা কিছু নেবে না?'

'না।'

'দু'টার আগে চলে এসো, নয়ত মা আবার মার খাবে।'

'চলে আসব।'

লিলি ক্লাসে পৌঁছল আর তাদের টিউটোরিয়াল শেষ হল। স্যার বললেন, Young Lady you are too early for the next class.

লিলি অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল। আজ আর কোন ক্লাস নেই। সে কি করবে বুঝতে পারছে না। স্বাতী তার টিউটোরিয়াল গ্রুপের না। সে অন্য গ্রুপে। সে কি আজ ইউনিভার্সিটিতে এসেছে? বৃহস্পতিবারে তার কি ক্লাস আছে? মনে পড়ছে না। লিলি কমনরুমের দিকে এগুলো। কমনরুমের দরজায় নীপা দাঁড়িয়ে আছে। নীপা বিচিত্র সব সাজ সজ্জা করে। আজ ঢলঢলা আলখাল্লার মত কি একটা পরে এসেছে। নীপা বলল, 'এই লিলি, বাজারে একটা গুজব শোনা যাচ্ছে, তোর জিগরি দোস্ত স্বাতী না–কি পঞ্চাশ বছরের এক ম্যারেড ম্যানকে বিয়ে করে বসে আছে। তার আগের স্ত্রী না–কি বিষটিষ খেয়ে হাসপাতালে দাখিল হয়েছে। ভদ্রলোকের বড় মেয়ে জাহাঙ্গীর নগর ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে।'

'জানি না।'

'জানিস ঠিকই। বলবি না।'

লিলি কমনরুমে ঢুকতে গিয়েও ঢুকল না। স্বাতী এসেছে কি না জানার জন্যে [illegible]

মেতে চাচ্ছিল। নীপার সঙ্গে দেখা হওয়ায় বোঝা গেল স্বাতী কমন রুমে নেই। স্বাতী কমন রুমে থাকবে আর নীপা কমন রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে এই সব কথা বলবে তা হয় না। নীপা বলল, 'চলে যাচ্ছিস না-কি?' আমাকে এক কাপ চা খাওয়া না লিলি। টাকা ছাড়া চলে এসেছি। চা খেতে পারছি না। খাওয়াবি এক কাপ চা?

লিলি নিতান্ত অনিচ্ছায় নীপাকে চা খাওয়াতে নিয়ে গেল। যতক্ষণ চা খাবে ততক্ষণ নীপা আজেবাজে কথা বলবে। এক মুহূর্তের জন্যেও থামবে না।

নীপা গলা নিচু করে বলল, 'তোর বান্ধবী না-কি পেট বাঁধিয়ে ফেলেছে? বিয়ে না করে গতিও ছিল না। তুই জানিস কিছু?'

'না।'

'জানিস ঠিকই। বলবি না। তবে এইসব খবর চাপা থাকে না। এক সময় সবাই জানবে।'

'জানুক।'

'স্বাতীদের টিউটোরিয়াল গ্রুপের সবাই অবশ্যি জেনে গেছে। কি হয়েছে শুনবি?'

'না।'

'আহ্ শোন না। শুনতে অসুবিধা কি? টিউটোরিয়াল ক্লাসের মাঝখানে স্বাতী হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। স্যারকে বলল, স্যার আমার শরীর খারাপ লাগছে। বলেই প্রায় ছুটে বের হয়ে গেল। সোজা বাথরুমের দিকে। বাথরুমের বেসিনে হড় হড় করে বমি।'

নীপার হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে লিলি খানিকক্ষণ একা একা ঘুরে বেড়াল। বাসায় যেতে ইচ্ছা করছে না। একা একা ঘুরতেও ভাল লাগছে না। ইউনিভার্সিটি ফাঁকা হয়ে আসছে। তবে মাঠে প্রচুর ছেলে মেয়ে আছে। এরা সন্ধ্যা পর্যন্ত আড্ডা দেবে। আড্ডা নানান ভঙ্গিমায় চলছে। কোথাও দল বেঁধে, কোথাও জোড়ায় জোড়ায়। স্বাতী থাকলে এদের দেখিয়ে মজার মজার কথা বলত-

'যখন দেখবি একটা মেয়ে দু'জন ছেলের সঙ্গে গল্প করছে, তখন বুঝবি প্রেমের ডেভেলপিং স্টেজ চলছে। একটা ছেলে হচ্ছে ক্যাটালিস্ট। এই স্টেজে তৃতীয় ব্যক্তি লাগে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে কথাবার্তা চলে।

যখন দেখবি দু'জন গল্প করছে, দু'জন হাসিখুশি তখন বুঝবি প্রাথমিক স্তর তারা অতিক্রম করে এসেছে। প্রেম শুরু হয়ে গেছে।

যখন দেখবি দু'জন আছে কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না, মুখ গম্ভীর করে বসে আছে, তখন বুঝবি প্রেম পেকে গেছে। পেকে টসটস করছে। খসে মাটিতে পড়ল বলে।

লিলির খুব একা একা লাগছে। স্বাতীদের বাসায় একটা টেলিফোন করে দেখবে? ইউনিভার্সিটি থেকে টেলিফোন করার নিয়ম কানুনও স্বাতী তাকে শিখিয়ে দিয়েছে।

'করবি কি শোন, যে কোন একটা অফিসে ঢুকে যাবি। অফিসের কেরানীকে বলবি "স্যার একটা টেলিফোন করব"। ওদের তো কেউ স্যার বলে না- স্যার শুনে খুশি হয়ে যাবে। নিজেই টেলিফোনের চাবি খুলে দেবে। আর তা যদি না হয় তাহলে কোন ইয়াং টিচারের কাছে যাবি। তাঁর দিকে তাকিয়ে মোটামুটি রহস্যময় ভঙ্গি করে হাসতে থাকবি। হাসবি চোখ নামিয়ে নিবি। আবার চোখ তুলে হাসবি। আবার চোখ নামিয়ে নিবি। স্যার তখন বলবে, কি খবর তোমার? তুই তখন বলবি, স্যার, বাসায় একটা টেলিফোন করব। আর দেখতে হবে না। স্যার টেলিফোনের ব্যবস্থা করে দেবে।'

লিলি স্বাতীকে টেলিফোন করাই ঠিক করল। স্বাতীর শেখানো পদ্ধতিতে কেরানীকে স্যার বলে চট করে টেলিফোন পেয়ে গেল।

স্বাতী খুশি খুশি গলায় বলল, 'লিলি তুই? ঘুম ভেঙেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তুই যে এমন কুম্ভকর্ণের মত ঘুমুতে পারিস তা তো জানতাম না। সকালে চলে আসার সময় তোর ঘুম ভাঙানোর এত চেষ্টা করলাম। তুই এখন করছিস কি?'

'টেলিফোন করছি।'

'সেটা বুঝতে পারছি। তুই কি আজ সারাদিন বাসায় থাকবি?'

'না। এখন আমি ইউনিভার্সিটিতে।

'সেকি! তুই ক্লাস করছিস। তুই ক্লাসে যাবি জানতে পারলে আমিও চলে আসতাম। আমার অবশ্যি শরীর খারাপ করেছে।'

'বমি করছিস?'

'বমি করব কেন শুধু শুধু? প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।'

'তোর নামে আজে বাজে সব কথা শোনা যাচ্ছে।'

'কে বলছে, নীপা? ওয়েল দে আই উইল স্টিচ হার লিপস। কাঁথা সেলাই করার সুঁচ দিয়ে ওর ঠোঁট সেলাই করে দেব। নো কিডিং।'

'টেলিফোন রেখে দিচ্ছি স্বাতী।'

'পাগল, টেলিফোন রাখবি কেন? আমি তো কথাই শুরু করিনি।'

লিলি টেলিফোন নামিয়ে রাখল। তার আর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। ভাল লাগছে না। কিছু ভাল লাগছে না। রিকশা নিয়ে সারাদিন শহরে ঘুরলে কেমন হয়? রাত আটটার আগে আজ সে বাসায় ফিরবে না। বাসার সবাই দুশ্চিন্তায় আধমরা হয়ে যাক। সবচে ভাল হয় বাসায় ফিরে না গিয়ে কয়েকদিন যদি কোথাও পালিয়ে থাকা যেত।

ইউনিভার্সিটি এখন প্রায় ফাঁকা। দারোয়ান ক্লাসরুমে তালাচাবি দিচ্ছে। করিডোর ফাঁকা। লিলি সিঁড়ি দিয়ে নামছে- আবারও নীপার সঙ্গে দেখা। এখন নীপার চোখে সানগ্লাস। চুলগুলিকে এর মধ্যেই কিছু করেছে কি না কে জানে। তাকে অন্য রকম লাগছে। নীপা চাপা গলায় বলল, 'বোরকাওয়ালী এখন কোথায় জানিস?'

লিলি কিছু বলল না। বোরকাওয়ালী হল তাদের ক্লাসের নূর জাহান বেগম। ক্লাসের একমাত্র মেয়ে যে বোরকা দিয়ে শরীর ঢেকে আসে। বোরকার ফাঁক দিয়ে সুন্দর দু'টি চোখ ছাড়া এই মেয়ের আর কিছুই দেখা যায় না। মেয়েদের কমনরুমেও বোরকাওয়ালী গা থেকে বোরকা খোলে না।

নীপা লিলির কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'বোরকাওয়ালী এখন বোরকার নীচে বেলী নাচ দিচ্ছে। বিশ্বাস না হয় ৬১১ নম্বর রুমে যা। ওরা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ওর গায়ে এখন বোরকা কেন, কিছুই নেই। কে জানে কি করছে।'

লিলি বলল, 'যা ইচ্ছা করুক।'

'প্লীজ, আয় একটু। তোর দেখা থাকলে আমার সুবিধা। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করে না। শনিবার ক্লাসে এসে তুই যখন বলবি তখন সবাই বিশ্বাস করবে।'

'নীপা শোন, আমার কিছু দেখারও ইচ্ছা নেই, বলারও ইচ্ছা নেই। যার যা ইচ্ছা করুক।'

লিলি রিকশা নিল।

রিকশায় উঠে রিক্সাওয়ালাকে বলা যায় না "আমি বিশেষ কোথাও যাব না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব'' অথচ লিলির কোন গন্তব্য নেই। আকাশের অবস্থা ভাল না। মেঘ জমতে শুরু করেছে। মেঘের ধরন-ধারণ ভাল না। বৃষ্টি শুধু না, ঝড় হবারও কথা। হোক, প্রচণ্ড ঝড় সব লণ্ড ভণ্ড করে দিক।

'আপা, যাইবেন কই?'

'কলাবাগান।'

'বাস স্ট্যান্ড?'

'বাস স্ট্যান্ড ছাড়িয়ে একটু ভেতরে।'

'দশ টাকা দিবেন।'

'চল, দশ টাকাই দেব।'

লিলি কলাবাগান যাচ্ছে কেন? কলাবাগান যাবার তার কোন ইচ্ছা নেই। কলাবাগান বাস স্ট্যান্ড ছাড়িয়ে একটু ভেতরে গেলেই হাসনাত সাহেবের বাড়ি। ঐ বাড়িতে যাবার জন্য সে রিকশা নেয়নি। তার পরেও সে কলাবাগানের কথা কেন বলল? সবচে ভাল হত আগামসি লেনে চলে গেলে। লিলির দু' নম্বর দাদীজান আগামসি লেনে থাকেন। লিলিকে দেখলে অসম্ভব খুশি হবেন। রাত আটটা পর্যন্ত আগামসি লেনে থাকা যায়। একেবারে রাতে খেয়ে টেমে বাসায় ফেরা।

রিকশাওয়ালা প্রাণপণে রিকশা টানছে। তার মনের ইচ্ছা মনে হয় যাত্রীকে বৃষ্টি নামার আগে আগে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া। কারণ একটু পর পর সে আকাশে মেঘের অবস্থা দেখতে চেষ্টা করছে।

কোথাও যাবার কথা বলে রিকশায় ওঠার বেশ কিছুক্ষণ পর যদি গন্তব্য স্থান বদল করা হয় তখন রিকশাওয়ালারা খুবই বিরক্ত হয়। তাঁরা ভদ্রতার ধার ধারে না। ভদ্রলোকের মত তারা তাদের বিরক্তি লুকিয়ে রাখে না। প্রকাশ করে। লিলি ঠিক করল প্রথম সে কলাবাগানেই যাবে। সেখান থেকে আরেকটা রিকশা নিয়ে আগামসি লেন।

লিলির রিকশাওয়ালাকে বৃষ্টি ধরে ফেলেছে। বৃষ্টি নেমেছে হুড়মুড় করে। রিকশাওয়ালা বিরক্ত মুখে পিছন ফিরে বলল, 'পর্দা লাগব আফা?'

'না।'

'ভিজতাছেন তো।'

'একটু ভিজলে অসুবিধা হবে না।'

লিলি একটু না, অনেকখানি ভিজল। ভেজা শাড়ি শরীরের সঙ্গে লেপ্টে কি অবস্থা হয়েছে। সিনেমায় নায়িকারাও এরকম করে বৃষ্টিতে ভিজে নাচগান করে না। শাড়িটা সুতির হলেও গায়ের সঙ্গে এতটা লেপ্টাতো না। লিলির পরনে জর্জেটের শাড়ি। জর্জেট বৃষ্টি পছন্দ করে।

গলির ভেতর রিকশাওয়ালা রিকশা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে দশ মিনিটও হয়নি। এর মধ্যেই গলিতে গলিতে হাঁটুর কাছাকাছি পানি। কোত্থেকে এল এত পানি?

রিকশাওয়ালা বলল, 'আফা কোন বাড়ি?'

লিলি ভয়ে ভয়ে বলল, 'ভাই শুনুন, আপনি কি আগামসি লেনে যাবেন?'

'কই?'

'আগামসি লেন?'

'এইটা মীরপুরের রিকশা। পুরান ঢাকায় যাব না।'

লিলিকে নেমে যেতে হবে। অন্য একটা রিকশা নিতে হবে, কিংবা কোন দোকানের সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে। সবাই মহা আনন্দ নিয়ে ভেজা জর্জেটের শাড়ির ভেতর দিয়ে লিলিকে দেখবে।

লিলি বলল, 'বাঁয়ের ঐ বাড়িটা। লোহার গেটওয়ালা বাড়ি।'

গেটের ভেতর রিকশা ঢুকল না। রিকশাওয়ালাকে দশ টাকার জায়গায় পনেরো টাকা দিয়ে লিলি লোহার গেট খুলে ঢুকে পড়ল। দরজায় হাত রাখতেই ফুটফুটে আট ন'বছরের একটা মেয়ে দরজা খুলে বের হয়ে বলল, 'আপনি কাকে চান?'

'এটা কি হাসনাত সাহেবের বাসা?'

'হ্যাঁ। আমি ওনার মেয়ে।'

'বাবা বাসায় নেই?'

'না, এসে পড়বে। আপনি ভিজে একেবারে কি হয়েছেন। ইশ। আসুন ভেতরে আসুন।'

'বাড়িতে কি তুমি একা?'

'হুঁ।'

'বল কি, এতবড় একটা বাড়িতে তুমি একা? ভয় লাগছে না?'

'লাগছে। আপনি ভেতরে আসুন।'

'পা যে কাদায় মাখামাখি –এই পা নিয়ে ঢুকব?'

'ঢুকে পড়ুন। বাথরুমে পা ধুয়ে ফেলবেন। আপনার তো শাড়ি বদলাতে হবে। ঘরে শুকনা শাড়ি আছে।'

'তোমার নাম কি?'

'জাহিন।'

'বাহ্, খুব সুন্দর নাম তো।'

'জাহিন নামের অর্থ হল বিচক্ষণ।'

'কোন ক্লাসে পড়?'

'ক্লাস ফোর।'

'এই যে তুমি অজানা অচেনা একটা মানুষকে ঘরে ঢুকালে আমি একটা খারাপ লোকও তো হতে পারতাম।'

জাহিন হাসি মুখে বলল, 'আপনাকে আমি চিনি। বাবার যার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল স্বাতী আন্টি, আপনি ওনার বন্ধু। আপনার নাম লিলি। স্বাতী আন্টি আপনার ছবি আমাকে দেখিয়েছে।'

'দেখেই তুমি চিনে ফেললে?'

'হুঁ। আমার স্মৃতিশক্তি খুব ভাল। আমি সব সময় পরীক্ষায় ফার্স্ট হই আপনি জানেন?'

'না, জানি না তো।'

'স্বাতী আন্টি আমার কোন কথা আপনাকে বলেনি?'

'না।'

'আশ্চর্য তো!' পরীর মত বাচ্চা মেয়েটি খুবই অবাক হল।

বাথরুমের দরজা খোলা, লিলি হাত মুখ ধুচ্ছে। খোলা দরজায় বাইরে জাহিন দাঁড়িয়ে আছে।

'শুকনা শাড়ি আপনার জন্যে নিয়ে আসি?'

'না, লাগবে না। যতটুকু ভিজেছে শুকিয়ে যাবে। ভেজা কাপড় মানুষের গায়ে খুব তাড়াতাড়ি শুকায়।'

'কেন?'

'মানুষের গা তো গরম। এই জন্যে।'

'আপনাকে কি আমি আন্টি ডাকব?'

'হ্যাঁ, ডাক।'

'শুনতে পারছেন ঝড় হচ্ছে।'

'তাই তো দেখছি।'

'আপনি না এলে আমি ভয়েই মরে যেতাম।'

'তোমার মত একটা বাচ্চা মেয়েকে একা রেখে তোমার বাবা যে চলে গেলেন, খুবই অন্যায় করেছেন। তোমার বাবা আসুন আমি তাঁর সঙ্গে কঠিন ঝগড়া করব।'

লিলি বাথরুম থেকে বের হয়েছে। আসলেই ঝড় হচ্ছে। প্রচণ্ড ঝড়। কাল বোশেখি। বছরের প্রথম কালবোশেখি।

জাহিন বলল, 'আমাদের বাড়িটা ভেঙে পড়ে যাবে না তো আন্টি?'

'না, ভাঙবে না।'

টিনের চালে শব্দ হচ্ছে। শব্দটা বৃষ্টির নয়। অন্যরকম। লিলি বলল, 'জাহিন শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। শিল কুড়াবে?'

'হুঁ।'

'তাহলে মাথায় একটা তোয়ালে জড়িয়ে আসি, আমরা শিল কুড়াব।'

বিপুল উৎসাহে লিলি শিল কুড়াচ্ছে। বাগানে ছোটাছুটি করছে। তার সঙ্গে আছে জাহিন। কাদায় পানিতে দু'জনই মাখামাখি। দু'জনেরই উৎসাহের সীমা নেই। লিলির নিজের বাড়ির কথা মনে নেই, সে যে সম্পূর্ণ অচেনা একটা বাড়িতে কিশোরীদের মত ছোটাছুটি করছে তাও মনে নেই। তার মনে হচ্ছে এত আনন্দ সে তার সারা জীবনে পায়নি। আম গাছের ডালে মটমট শব্দ হচ্ছে, ডাল ভাঙছে বোধ হয়। লিলি চেঁচিয়ে বলল, 'জাহিন ঘরে আয়, আয়।' মেয়েটিকে সে তুই তুই করে বলছে। তাই তার কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। দু'জন ছুটে যাবার সময় একটা গর্তের ভেতর পড়ে গেল। সেখানে অনেকখানি পানি। জাহিন এবং লিলি দু'জনই হি হি করে হাসছে। জাহিন কিছু ময়লা পানি খেয়েও ফেলেছে।

ভেজা শাড়ি লিলিকে শেষ পর্যন্ত পাল্টাতে হল। কাদায় মাখামাখি হওয়া নোংরা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে থাকা যায় না। জাহিন শাড়ি এনে দিল। পুরনো শাড়ি। জাহিনের মা'র শাড়ি। এমন একজনের যে বেঁচে নেই কিন্তু শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে তার শরীরের গন্ধের কিছুটা হয়ত থেকে গেছে। লিলির অস্বস্তির সীমা রইল না।

ঝড় বৃষ্টি থেমে গেছে। ইচ্ছে করলে লিলি চলে যেতে পারে। সেই ইচ্ছা করার উপায় নেই, মেয়েটি একা। বাবা যে এখনো ফিরছে না তা নিয়ে তার মাথা ব্যথাও নেই। সে মনে

হচ্ছে নতুন পরিস্থিতিতে ভালই আছে। বাবা একেবারে না এলেই যেন ভাল। তাহলে নতুন আন্টিকে নিয়ে আরও অনেক মজা করা যায়।

লিলি বলল, 'ঠাণ্ডায় শরীর কাঁপছে। জাহিন, চা খেতে হবে।'

জাহিন বলল, 'আন্টি আমি চা বানাতে পারি না।'

'তোকে চা বানাতে হবে না। আমি বানাব। কোথায় চা কোথায় চিনি এইসব দেখিয়ে দিলেই হবে।'

'এইসবও তো আমি জানি না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা খুঁজে বের করব।'

'আমিও চা খাব আন্টি।'

'ঠিক আছে। আমাকে রান্নাঘর দেখিয়ে দে।'

রান্নাঘর দেখিয়ে দেবার আগেই হাসনাত এসে পড়ল। লিলিকে দেখে সে যতটা না চমকালো তার চেয়ে বেশি বোধ করল স্বস্তি।

'তুমি কখন এসেছ?'

'অনেকক্ষণ, ঝড়ের আগে।'

'বাঁচা গেছে। আমি কি দুশ্চিন্তা করছিলাম! জাহিনকে একা বাসায় ফেলে গেছি, শুরু হল ঝড় বৃষ্টি।'

'একা ফেলে গেলেন কিভাবে?'

'আধ ঘন্টার জন্যে গিয়েছিলাম। সেটাও ঠিক হয়নি। উপায় ছিল না। আধ ঘন্টার জন্যে গিয়ে এই যে আটকা পড়লাম, আর বের হতে পারি না। ঝড়ে আটকা পড়িনি, ঝড় কোন ব্যাপারই না। অন্য ঝামেলায় আটকা পড়েছি।'

লিলি খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, 'আপনি আমাকে দেখে অবাক হননি?'

'হয়েছি। তবে তেমন অবাক হইনি। তুমি আসবে সেটা ধরেই নিয়েছিলাম। শান্তি দূত পাঠাবে। তুমি ছাড়া তার আর দূত কোথায়?'

জাহিন বলল, 'বাবা আন্টি চা খাবে। আমিও খাব।'

হাসনাত ব্যস্ত হয়ে বলল, 'চা বানিয়ে নিয়ে আসছি। তোমরা বোস।'

লিলি বলল, 'আমাকে জিনিসপত্র দেখিয়ে দিন আমি বানিয়ে আনছি।'

'না না, তুমি অতিথি। তুমি বোস। তুমি হলে ফরেন এ্যামব্যাসেডার। আমি ফরেন এ্যামব্যাসেডারকে দিয়ে চা বানাব, তা হয় না।'

লিলি স্বস্তি বোধ করছে। হাসনাত সাহেব সহজ স্বাভাবিক আচরণ করছেন। একজন সহজ হলে অন্যজনের সহজ হওয়া সমস্যা হয় না। লিলি বলল, 'আপনি চা বানানোর সময় আমরা দু'জন যদি পাশে দাঁড়িয়ে দেখি তাহলে কি কোন অসুবিধা আছে?'

'না, অসুবিধা নেই। ভাল কথা, লিলি তুমি মনে হয় দুপুরে খাওনি।'

'দুপুরে খাইনি যে বুঝলেন কি করে?'

'আর্টিস্টের প্রধান কাজ হচ্ছে দেখা। একজন আর্টিস্ট যদি ক্ষুধার্ত মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে না পারে সে ক্ষুধার্ত, তাহলে সে কোন বড় আর্টিস্টই না।'

'আপনার ধারণা আপনি বড় আর্টিস্ট?'

হাসনাত হাসতে হাসতে বলল, 'আমার সে রকমই ধারণা। তবে অন্যদের ধারণা অবশ্যি

তা না। লিলি শোন, ঘরে খাবার কিছু নেই। পাউরুটি আছে টোস্ট করে দিতে পারি। ডিম আছে পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে ভেজে দিতে পারি। দেব?'

'দিন।'

'তুমি বাতীর হয়ে যে সব কথা বলতে এসেছ তা কি জাহিনের সামনে বলতে পারবে নাকি তাকে দূরে সরিয়ে দেব?'

'ও বেচারী একা একা কোথায় বসে থাকবে?'

'ওকে গল্পের বই পড়তে পাঠিয়ে দেব। গল্পের বই ধরিয়ে দিলে ওর আর কিছুই লাগে না। আধ ঘন্টার জন্যে যে গিয়েছিলাম, জাহিনের হাতে গল্পের বই ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম।'

'আপনার মেয়েটি খুব ভাল।'

'মেয়ে সম্পর্কে আমার নিজেরও তাই ধারণা। ও তার মার মত হয়েছে। স্বভাব চরিত্র অবিকল তার মার মত। অন্যকে নিজের করতে তার পাঁচ মিনিট লাগে। তবে তার মা এত সুন্দর ছিল না। তার চেহারাটা সাদামাটা ছিল। নাক মুখ ছিল ভোঁতা ভোঁতা। জাহিনের ফিচার্স খুব শার্প। ওর চোখ যদি একটু বড় হত তাহলে সতেরো আঠারো বছর বয়সে সে সেরা রূপসীদের একজন হত। তোমাকে ছাড়িয়ে যেত।'

'আপনারা আর্টিস্টরা মানুষের চেহারা খুব খুঁটিয়ে দেখেন, তাই না?'

'সবাই দেখে না। আমি দেখি। আমি পোর্ট্রেটের কাজ বেশি করি, আমাকে দেখতে হয়।'

লিলি বেশ আগ্রহ নিয়েই হাসনাতের কাণ্ডকারখানা দেখছে। ভদ্রলোক বেশ নিপুণ ভঙ্গিতে ডিম ফেটলেন। চাকু দিয়ে পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ কুচি কুচি করে কাটলেন। লবণ মিশিয়ে ফুটন্ত তেলে ডিম ভাজলেন। ডিম কড়াইয়ে লেগে গেল না, গোলাপী হয়ে ফুলে উঠল।

হাসনাত বলল, 'লিলি ঘরে মাখন আছে। রুটিতে মাখন লাগিয়ে দেব?'

'দিন।'

'রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো খেতে পারবে না। আমার স্টুডিওতে চলে যাও। জাহিন দেখিয়ে দেবে। জাহিন শোন, তুমি ওনাকে আমার স্টুডিওতে নিয়ে যাও। তারপর তুমি গল্পের বই নিয়ে বোস।'

জাহিন গম্ভীর গলায় বলল, 'তোমরা গোপন কথা বলবে?'

'গোপন কথা বলব না। এমন কিছু কথা বলব যা ছোটদের শুনতে ভাল লাগবে না।'

'আমার সব কথাই শুনতে ভাল লাগে।'

'ভাল লাগলেও শোনা যাবে না।'

স্টুডিও বিশাল কিছু না। মাঝারি আকৃতির ঘর। ঘরে জানালা বন্ধ বলে গুমোট গুমোট ভাব। কড়া তার্পিন তেলের গন্ধ। নানান রঙের বাটি। বেতের চেয়ার কয়েকটা আছে। চেয়ারে ধুলার আস্তর দেখে মনে হয় চেয়ারগুলি ব্যবহার হয় না। এক কোণায় ক্যাম্প খাটে মশারি খাটানো। ঘুপটি ঘরের ক্যাম্প খাটে কে ঘুমায়?

লিলি চেয়ারে বসেছে। তার হাতে চায়ের কাপ। হাসনাত বসেছে মেঝের কার্পেটে। অনেকটা পদ্মাসনের ভঙ্গিতে। বন্ধ জানালা খুলে দেয়ায় গুমোট ভাবটা নেই। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। হাসনাতের হাতে সিগারেট। সে সিগারেটে টান দিয়ে বলল, 'বাতী তোমাকে তার ছবিটার জন্যে পাঠিয়েছে, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'ওর মনে ভয় ঢুকে গেছে আমি এই ছবি সবাইকে দেখিয়ে বেড়াব। তাই না?'

'হুঁ।'

'তুমি ওকে বুঝিয়ে বলবে যে এ জাতীয় কাজ আমি কখনোই করব না। আর্টিস্ট হিসেবে আমি পিকাসো না, কিন্তু মানুষ হিসেবে বড়। তুমি বরং এক কাজ কর, আমি ছবিটা ভাল মত র‍্যাপ করে দিচ্ছি। নিয়ে যাও, ওকে দিয়ে দেবে। তবে বড় ছবি নিতে তোমার হয়ত কষ্ট হবে।'

'কষ্ট হবে না। আমি নিতে পারব।'

'বাতী তোমার খুব ভাল বন্ধু, তাই না?'

'হ্যাঁ। আমার একজনই বন্ধু। আপনি বোধ হয় ওর উপর খুব রেগে আছেন।'

'আমি তার উপর মোটেই রেগে নেই। আমার একটা ক্ষীণ সন্দেহ সব সময়ই ছিল যে এই জাতীয় কিছু সে করে বসবে।'

'এরকম সন্দেহ হবার কারণ কি?'

'হুট করে আসা আবেগ হুট করেই চলে যায়। বাতী বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে শেষ মুহূর্তে হলেও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। বোকা মেয়েগুলি ধরতে পারে না। বাতী না হয়ে অন্য কোন মেয়ে হলে কি করত জান? বিয়ে করে ফেলতো তারপর নানান অশান্তি। আমি আমার মেয়েটাকে নিয়ে পড়তাম বিপদে।'

'বিয়ে ভেঙে দিয়ে আপনার জন্যেও ভাল হয়েছে।'

'হ্যাঁ, আমার জন্যে ভাল হয়েছে। আসলে একা থাকতে থাকতে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। নতুন করে সংসার শুরু করা আমার জন্যে কষ্টকর হত। আমার বিয়েতে রাজি হবার প্রধান কারণ কিন্তু আমার মেয়ে। ওর একজন মাদার ফিগার দরকার। মায়ের জন্যে মেয়েটার ভেতর তৃষ্ণা জন্মেছে। যেই এ বাড়িতে আসে মেয়েটা তার মধ্যেই তার মাকে খোঁজে।'

'বাতীর কাছে এই ব্যাপারটা কখনো বলেছেন?'

'বলেছি। এ-ও বলেছি জাহিনই যে তার মা'কে খোঁজে তাই না, আমি নিজেও তার ভেতর আমার স্ত্রীকে খুঁজছি। এখন বুঝতে না পারলেও একদিন বুঝবে। তখন সে কষ্ট পাবে।'

'ও বুঝতে চায়নি?'

'না, বুঝতে চায়নি। তোমাদের মত বয়েসী মেয়েদের সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে অন্যের যুক্তি ছোট করে দেখা। এই সময়ে মেয়েদের নিজেদের উপর আস্থা থাকে খুব বেশি।'

'এটা কি খারাপ?'

'খারাপ না, ভাল। তবে শুধু নিজেদের উপর আস্থা থাকবে অন্যদের উপর থাকবে না এটা খারাপ। তুমি কি আরেক কাপ চা খাবে লিলি?'

'জি না, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে আমি এখন যাব। আপনি ছবিটা দেবেন বলেছিলেন দিয়ে দিন।'

'তুমিও দেখি আমার উপর বিশ্বাস করতে পারছ না।'

'আমি পারছি।'

'তাহলে ছবিটা সঙ্গে নেয়ার জন্যে এত ব্যস্ত কেন?'

'বাতী খুব মানসিক চাপের ভেতর আছে। ছবিটা পেলে চাপ থেকে মুক্ত হবে। ও খুব খুশি হবে।'

'ছবিটা দিয়ে তাকে খুশি করতে চাচ্ছ?'

'জ্বি।'

'দিচ্ছি, ছবি দিয়ে দিচ্ছি। তুমি না এলেও তার ছবি আমি তাকে দিয়ে দিতাম। ছবিটা হয়েছে খুব সুন্দর। দেখতে চাও?'

'জ্বি না।'

'দেখতে পার। নগ্নতা তো কোন লজ্জার বিষয় হতে পারে না। লজ্জার বিষয় হলে প্রকৃতি আমাদের কাপড় পরিয়ে পৃথিবীতে পাঠাতো। আমরা নগ্ন হয়ে পৃথিবীতে এসেছি। নগ্নতার জন্যে লজ্জিত হবার বা অস্বস্তি বোধ করার আমি কোন কারণ দেখি না।'

লিলি নিচু গলায় বলল, 'আমি ছবিটা দেখতে চাচ্ছি না।'

'লজ্জা পাচ্ছ যখন আমার সামনে দেখার দরকার নেই কিন্তু বাতীর কাছ থেকে একবার দেখে নিও।'

'ওকে কি কিছু বলতে হবে?'

'ওকে শুধু বলবে, ছবিটা যেন নষ্ট না করে। একদিন সে বুড়ো হয়ে যাবে। দাঁত পড়বে, চুলে পাক ধরবে তখন যদি ছবিটা দেখে, তীব্র আনন্দ পাবে। লোকে বলে যৌবন ধরে রাখা যায় না– এটা ঠিক না। আমি তার যৌবন ধরে রেখেছি। আলোর একটা খেলা ছবিটাতে আছে। এত সুন্দর কাজ আমি খুব কম করেছি। চল তোমাকে রিক্সায় তুলে দিয়ে আসি। এরকম বিশাল ছবি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে অস্বস্তি লাগবে না তো?'

'না।'

'তুমি বললে বাতীদের বাড়ির গেট পর্যন্ত আমি ছবিটা পৌঁছে দিতে পারি। আমি গেট থেকে বিদায় নেব। গেট থেকে বাড়ি পর্যন্ত তুমি নিয়ে গেলে।'

'না না, আপনি থাকুন। আহিরের সঙ্গে গল্প করুন। আপনার মেয়েটা অসম্ভব ভাল।'

'আগে একবার বলেছ।'

'আবারও বললাম। একটা মিথ্যা একবারের বেশি দু'বার বলা যায় না। সত্য কথা অসংখ্যবার বলা যায়।'

বাতী লিলিকে দেখে আকাশ থেকে পড়ল। ভর সন্ধ্যায় রিকশায় পাঁচ ফুট বাই চার ফুট ছবি নিয়ে লিলি একা একা উপস্থিত হবে এটা ভাবাই যায় না। লিলির মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। হাত দিয়ে ছবি সামলাতে তার মনে হয় কষ্টও হয়েছে।

লিলি বলল, 'নে তোর ছবি।'

বাতী বলল, 'থ্যাংকস্, থ্যাংকস্, মেনি থ্যাংকস। থ্যাংকস ছাড়া আর কি চাস বল?'

'আর কিছু চাই না।'

'চাইতে হবে। কিছু একটা চাইতে হবে। তোর মুখ টুখ শুকিয়ে কি হয়ে গেছে –খুব ঝামেলা গেছে, তাই না?'

'ঝামেলা হয়নি।'

'চাইতেই দিয়ে দিল?'

'হুঁ।'

'আয়, ঘরে এসে বোস। তোকে দেখে মনে হচ্ছে খুব টেনশনে আছিস।'

'সন্ধ্যা হয়ে গেছে আমি বাসায় চলে যাব।'

'পাগল হয়েছিস? তোকে আমি এখন ছাড়ব নাকি? গল্প গুজব না? তোর কোন ভয় নেই, আমি তোকে গাড়ি করে বাসায় পৌঁছে দেব। আয়।'

লিলির নিজেকে যন্ত্রের মত লাগছে। বাড়ির কথা তার এতক্ষণ মনে হয়নি। এখন মনে হচ্ছে। বাড়িতে কোন নাটক হচ্ছে কে জানে। সে বাড়িতে পা দেয়া মাত্র নাটক কোন দিকে মোড় নেবে তাও জানে না।

বাতী বলল, 'এরকম মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন, আয়।'

লিলি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে রওনা হল। বাতীর হাতে ফ্রেম করা ছবি। বিশাল দেখালেও তেমন ওজন নেই। নাজমুল সাহেব বসার ঘরের সোফায় বার্নিশ দিচ্ছিলেন। তার নাকে রুমাল বাঁধা। তিনি বললেন, 'লিলি সন্ধ্যাবেলা কোত্থেকে?'

বাতী বলল, 'ও আমার জন্যে একটা গিফট নিয়ে এসেছে বাবা। একটা পেইনটিং। আমার জন্মদিনের উপহার। জন্মদিনে আসতে পারেনি। আজ উপহার নিয়ে এসেছে।'

'এত বড় পেইনটিং?'

'হুঁ, বিশাল। এখন তোমরা দেখতে পাবে না। কোন এক শুভক্ষণে তত উদ্বোধন হবে।'

'লিলি মা কি আজ থাকবে আমাদের বাসায়?'

লিলি বলল, 'জ্বি না চাচা।'

'থেকে যাও মা। থেকে যাও। হৈ চৈ কর। গল্প গুজব কর। বয়সটাই তো হৈ চৈয়ের। গল্প গুজবের। কিছুদিন পর হৈ চৈ করতেও ভাল লাগবে না। গল্প গুজব করতেও ভাল লাগবে না। সময় কাটবে রান্নাঘরে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা আছে না,

'রাঁধার পর খাওয়া
খাওয়ার পর রাঁধা
এই চক্রেতেই জীবন খানি বাঁধা।'

বাতী বলল, 'তোমাকে কবিতা আবৃত্তি করতে হবে না বাবা। তুমি বার্নিশ চালিয়ে যাও। আমরা অনেকক্ষণ গল্প করব। তারপর তুমি তোমার গাড়িটা ধার দেবে, আমি লিলিকে পৌঁছে দেব।'

বাতী ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। ব্যস্ত ভঙ্গিতে ছবির উপর ভাঁজ করে রাখা কাগজ সরাতে লাগল। খুশি খুশি গলায় বলল, 'তুই একটু দূরে গিয়ে দাঁড়া লিলি। দূর থেকে দেখ কত সুন্দর ছবি। একটু দূরে না দাঁড়ালে বুঝতে পারবি না। ঘরে আলো কম। আরেকটু আলো থাকলে ভাল হত। তুই দরজার কাছে যা লিলি। দরজার কাছ থেকে দেখ।'

লিলি দেখছে।

সে নড়তে পারছে না। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। নগ্ন মেয়েটিকে দেখতে মোটেই অস্বাভাবিক লাগছে না। মনে হচ্ছে এটাই স্বাভাবিক। খোলা জানালার আলো এসে মেয়েটির পিঠে পড়েছে। বই পড়তে পড়তে একটু আগে মনে হয় মেয়েটি একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছে। মধ্যাহ্নের সেই দীর্ঘ নিশ্বাস আটকে আছে ছবির ভেতর।

বাতী মুগ্ধ গলায় বলল, 'ছবি দেখে বুঝতে পারছিস আমি কত সুন্দর?'

লিলি জবাব দিল না। সে এখনো চোখ ফেরাতে পারছে না।

'কি রে, ছবিটা কেমন তা তো বলছিস না।'

'সুন্দর।'

'শুধু সুন্দর? আর কোন বিশেষণ ব্যবহার করবি না?'

লিলি মুগ্ধ গলায় বলল, 'ছবিটা ওনার কাছ থেকে আমরা ঠিক হয়নি। উনি ছবিটা খুব মমতা দিয়ে এঁকেছেন।'

স্বাতী বলল, 'তুই কি চাস তোর এরকম একটা ছবি আঁকা হোক?'

'চুপ কর।'

'আচ্ছা যা চুপ করলাম। যদিও তোর চোখে তৃষ্ণার ছায়া দেখতে পাচ্ছি। তোর মন বলছে, আহারে আমার যদি এরকম একটা ছবি থাকতো। বুঝলি লিলি, মানুষের পুরো জীবনটা হল এক গাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপূর্ণ তৃষ্ণার সমষ্টি। A Collection of unfulfilled desires. অধিকাংশ তৃষ্ণা মেটানো কিন্তু কঠিন না। মেটানো যায়। সাহসের অভাবে আমরা মিটাতে পারি না।'

'বেশি বেশি সাহস কি ভাল?'

'সাহস হল মানুষের প্রধান কিছু গুণের একটি।'

'স্বাতী আমি বাসায় যাব। আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আয়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমি এখন একা বাসায় যেতে পারব না।'

'দেব, বাসায় পৌঁছে দেব। এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? তুই আমার কাছে একটু বোস। গুছিয়ে বল তো শুনি ছবির ব্যাপারটা ওকে কিভাবে বলেছিস।'

'সাধারণভাবে বলেছি।'

'তোরা দু'জনে মিলে কি অনেকক্ষণ গল্প করেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'মানুষটাকে ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে না?'

'হ্যাঁ।'

'ইন্টারেস্টিং কেন মনে হয়েছে বল তো?'

'জানি না। আমি তোর মত এত বিচার বিশ্লেষণ করি না।'

স্বাতী গম্ভীর গলায় বলল, 'লোকটাকে ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে কারণ তার মধ্যে একটা গৃহী ভাব আছে। অধিকাংশ পুরুষ মানুষের মুখের দিকে তাকালে মনে হয় এদের মন পড়ে আছে বাইরে। হাসনাতের বেলায় উল্টোটা মনে হয়। ওকে বিয়ে করলে জীবনটা ইন্টারেস্টিং হত।'

'তাহলে বিয়ে করলি না কেন?'

স্বাতী জবাব দিল না। হাসতে লাগল। হাসি থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'বুধবার বিয়ে হবার কথা, মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ মনে হল ও আসলে আমাকে ভালবাসে না। ও আমার মধ্যে অন্য কাউকে খুঁজছে। প্রবল ভাবেই খুঁজছে। ওকে বিয়ে করলে সুখি একটা পরিবার তৈরি হত। এর বেশি কিছু না।'

লিলি বলল, 'সুখি পরিবার তুই চাস না?' স্বাতী লিলির দিকে ঝুঁকে এসে বলল, 'আমাদের পরিবারটা দেখে তোর মনে হয় না, কি সুখি একটা পরিবার? মনে হয় কি না বল?'

'হয়।'

'বাবাকে দেখে মনে হয়, বাবা মা'র জন্যে কত ব্যস্ত। মা'কে দেখে মনে হয় স্বামী অন্তপ্রাণ। স্বামী কি খেয়ে খুশি হবে এই ভেবে এটা রাঁধছে, ওটা রাঁধছে। তার ডায়াবেটিস

বেড়ে যাবে এই জন্যে চা খেতে দিচ্ছে না। আসলে পুরোটাই ভান।'

'ভান?'

'অবশ্যই ভান। এক ধরনের প্রতারণা। ভালবাসা ভালবাসা খেলা।'

'বুঝলি কি করে খেলা?'

'বোঝা যায়। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। যে জন্যে বাবা দিন রাত নিজের কাজ নিয়ে থাকে। এই ফার্নিচারে বার্নিশ ঘষছে, ঐ করাত দিয়ে কাঠ কাটছে। মা আছে রান্নাঘরে। অথচ কথা বলার সময় একজনের জন্যে অন্যজনের কি গভীর মিথ্যা মমতা।'

'মিথ্যা মনে করছিস কেন? মমতা তো সত্যিও হতে পারে।'

'আমি জানি সত্যি না। তারা খেলছে পাতানো খেলা। পৃথিবীটাই পাতানো খেলার জায়গা। এই খেলা তুই হয়ত খেলবি। আমি খেলব না।'

লিলি বলল, 'তোর দার্শনিক কথাবার্তা শুনতে আমার এখন ভাল লাগছে না। আমি বাসায় যাব।'

'চল তোকে দিয়ে আসি। ও আচ্ছা, তোকে বলতে ভুলে গেছি। এর মধ্যে কতবার যে তোর খোঁজে তোর বাবা টেলিফোন করেছেন। তুই নেই বলার পরেও বিশ্বাস করেননি। একবার নিজে এসে দেখে গেছেন। তুই কি বাসায় কাউকে না বলে এসেছিস?'

'হুঁ।'

'তাহলে তো বাসায় গেলে আজ সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'হুঁ।'

'তোর বাবা তোকে কিমা বানিয়ে ফেলবে।

লিলি ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তার হাত কাঁপতে শুরু করেছে।

লিলি বাসায় পৌঁছল রাত দশটার একটু আগে। স্বাতী তাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়েছে। সে বাড়ির সামনে নামেনি, গলির সামনে নেমে হেঁটে হেঁটে বাসায় গিয়েছে। বাড়ির সদর দরজা খোলা, প্রতিটি বাতি জ্বলছে। বাড়িতে ভয়ংকর কিছু ঘটেছে তা আলো দেখলে বোঝা যায়। ভয়ংকর কিছু ঘটলে মানুষ যেখানে যত বাতি আছে জ্বেলে দেয়।

লিলি ভয়ে ভয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তাকে প্রথম দেখল মতির মা। সে এক গোছা বাসন-কোসন নিয়ে কলঘরের দিকে যাচ্ছিল। লিলিকে দেখেই– "ও আফাগো" বলে বিকট চিৎকার দিল। হাত থেকে সম্ভবত ইচ্ছে করেই সব বাসন কোসন ফেলে দিল। ঝন ঝন শব্দ হল। দোতলা থেকে ঝুনু ঝুমু এক সঙ্গে নীচে নামছে।

বড় চাচা তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসেছেন।

তিনি বললেন, 'কোথায় লিলি, আয় দেখি আমার ঘরে আয়।'

লিলি ঝুমুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা কোথায় রে?'

ঝুমু বলল, 'মা'র বিকেল থেকে বুকে ব্যথা হচ্ছে। মা শুয়ে আছে। মা'র ধারণা তুমি আর ফিরে আসবে না।'

'বাবা! বাবা কোথায়?'

'বাবা তোমাকে খুঁজতে গেছে।'

'কোথায় খুঁজতে গেছে?'

'কোথায় আর খুঁজবে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। আর ছোট চাচা গেছে হাসপাতালে।'

রুমু বলল, 'আমার এতক্ষণ ভয় লাগেনি। এখন ভয় লাগছে। ভয়ে হাত পা কাঁপছে আপা।'

'কেন?'

'মনে হচ্ছে বাবা ফিরে এসে তোমাকে খুনটুন করে ফেলবে।'

বড় চাচা বারান্দা থেকে আবারও ডাকলেন, 'লিলি কোথায়?'

লিলি বলল, 'চাচা আপনি ঘরে যান। আমি আসছি।'

'তাড়াতাড়ি আয়।'

লিলি মা'র ঘরে গেল। সব ঘরের বাতি জ্বলছে।

শুধু এই ঘরের বাতি নেভানো। লিলি দরজা থেকে ডাকল– 'মা।'

ফরিদা বুকে তীব্র ব্যথা নিয়ে অনেক কষ্টে পাশ ফিরলেন। চাপা গলায় বললেন, 'বাতি জ্বালা।'

লিলি বাতি জ্বালাল। মায়ের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। একদিনে মানুষটা কেমন হয়ে গেছে। যেন একজন মরা মানুষ। তিনি বললেন, 'তুই ভাত খেয়েছিস?'

লিলির খুবই অবাক লাগছে। তাকে দেখে তার মা'র মনে প্রথম যে কথাটা মনে হল তা হচ্ছে, সে ভাত খেয়েছে কি না। সব মা কি এরকম? না শুধু তার মা? ফরিদা বললেন, 'তুই আলুভাজি পছন্দ করিস, তোর জন্যে আলুভাজি করেছি।'

'তোমার কি বুকে ব্যথা খুব বেশি মা?'

'হ্যাঁ।'

'হাত বুলিয়ে দেব?'

'দে।'

নেয়ামত সাহেব বাড়ি ফিরলেন রাত এগারোটার দিকে। লিলি তার ঘরে শুয়েছিল। রুমু দৌড়ে এসে খবর দিল। ভয়ে কাঠ হয়ে লিলি অপেক্ষা করছে। কখন তার ডাক পড়ে। তার ডাক পড়ছে না।

রুমু কিছুক্ষণ পর আবার এসে জানাল, 'বাবা বারান্দায় বসে কাঁদছে।'

হ্যাঁ, কান্নার শব্দ লিলি শুনছে। কি বিশ্রী শব্দ করে কান্না।

কান্না থামার পরেও নিয়ামত সাহেব তার মেয়েকে কাছে ডাকলেন না। তিনি এক বৈঠকে একশ' রাকাত নামাজ মানত করেছিলেন। তিনি মানত আদায় করতে জলচৌকিতে উঠে বসলেন।

শুধু নামাজ না, দু'টি খাসিও মানত করা হয়েছিল। জাহেদুর রহমান রাতেই আমিন বাজার থেকে খাসি কিনে এনেছে। খাসি দু'টি ব্যা ব্যা করেই যাচ্ছে।

লিলিদের যেখানে যত আত্মীয়-স্বজন ছিল সবাই আসতে শুরু করেছে। সবার কাছেই খবর গিয়েছে লিলিকে পাওয়া যাচ্ছে না। এমদাদিয়া মাদ্রাসার এক হাফেজ সাহেবকে সন্ধ্যা বেলায় খবর দিয়ে আনা হয়েছিল কোরান খতম করার জন্যে। তিনি সাত পারা পর্যন্ত পড়ে ফেলেছেন। এখন অষ্টম পারা শুরু করেছেন। বাড়িতে হৈ চৈ ভিড়। কোন কিছুই তাঁকে বিচলিত করছে না। তিনি এক মনে কোরান পাঠ করে যাচ্ছেন।

……

রাতে লিলি মরার মত ঘুমিয়েছে। একবার শুধু ঘুম ভেঙেছে। তখন দেখে মা তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছেন। সে ঘুমঘুম গলায় ডাকল, 'মা।' ফরিদা তৎক্ষণাৎ বললেন, 'কি গো মা।'

'কিছু না ঘুমাও।' বলেই লিলি ঘুমিয়ে পড়ল। সেই ঘুম ভাঙল সকাল দশটায়। ঘরের ভেতর আলো, বিছানায় চনমনে রোদ। ঘুম ভাঙার পরেও অনেকক্ষণ সে বিছানায় শুয়ে রইল। এক ফাঁকে রুমু এক উঁকি দিল। রুমুর ঠোঁটের ফোলা কমেনি, আরো মনে হয় বেড়েছে। তার মুখ লালচে হয়ে আছে। কাল রাতে লিলি এটা লক্ষ্য করেনি।

'তোর ঠোঁটের অবস্থা তো খুব খারাপ।'

'হুঁ।'

'ব্যথা করছে না?'

'করছে।'

'ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার তো।'

রুমু সহজ গলায় বলল, 'বড় চাচা হোমিওপ্যাথি করতে বলেছেন। সামছুদ্দিন চাচা ওষুধ দিয়েছেন।'

'ইনজেকশন দেয়ার কথা যে ছিল দেয়া হচ্ছে না?'

'না। হোমিওপ্যাথি কাজ না করলে তখন দেয়া হবে।'

'এর মধ্যেই তো মনে হয় গ্যাংগ্রীন প্যাংগ্রীন হয়ে তুই মরে যাবি।'

'হুঁ।'

লিলি বোনের দিকে তাকিয়ে আছে। এত যন্ত্রণা শরীরে নিয়ে সে কত স্বাভাবিকই না আছে। রুমু বলল, 'আপা তুমি চা খাবে? তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি?'

'হাত মুখ ধুইনি তো এখনো।'

'তুমি হাত মুখ ধোও আমি চা নিয়ে আসছি।'

হাত মুখ ধুতে যাবার কোন ইচ্ছা করছে না। বিছানায় শুয়ে আরো খানিকক্ষণ গড়াগড়ি করতে ইচ্ছা করছে। বারান্দা থেকে বাবার গলা শোনা যাচ্ছে, 'খবরের কাগজ কোথায়? এখনো দেয় নাই? হারামজাদা হকারকে আমি খুন করে ফেলব।'

বাবা আজ তাহলে অফিসে যান নি। লিলির সঙ্গে তাঁর এখনো দেখা হয়নি। লিলি জানে

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ডাক পড়বে। কাল সারাদিন কোথায় ছিল, অত রাতে কোত্থেকে এসেছে, কে তাকে নামিয়ে দিয়ে গেছে, অন্য একটা শাড়ি পরে সে বাসায় ফিরেছে, শাড়িটা কার? প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা হবে।

লিলি ঠিক করেছে সব প্রশ্নের জবাব সে দেবে। শান্ত ভঙ্গিতেই দেবে। বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে সে কথা বলতে পারে না। আজ বলবে।

বাবার সঙ্গে কথা বলার পর সে যাবে বড় চাচার ঘরে। বড় চাচাকে বলবে, বুবুর ঠোঁটের এই অবস্থা। আর আপনি তাকে হোমিওপ্যাথি করাচ্ছেন। তাকে এক্ষুণি ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। ভাল কোন ডাক্তার। বড় চাচা যদি বলেন, 'ডান দিকের জানালার পাল্লাটা একটু টেনে দে' তখন সে বলবে, চাচা পাল্লাটা তো আপনার হাতের কাছেই। আপনি নিজেই একটু টেনে নিন।

তারপর সে নীচে নামবে। রমু ঝুমুর স্যার যদি ইতিমধ্যেই এসে থাকেন তাহলে তাঁকে বলবে, এই যে ভদ্রলোক শুনুন, সবার সামনে বিশ্রী ভঙ্গিতে নাকের লোম ছিঁড়বেন না। আবার কখনো যদি আপনাকে এই কাজ করতে দেখি তাহলে আপনার নাক আমি কেটে ফেলব।

ঝুমু চা নিয়ে এসেছে। লিলি বাসি মুখেই চায়ে চুমুক দিচ্ছে। চা-টা খেতে ভাল লাগছে। ঝুমু পাশে দাঁড়িয়ে আগ্রহ নিয়ে চা খাওয়া দেখছে। লিলি বলল, কিছু বলবি ঝুমু?'

'না।'

'কাল ফিরতে দেরি করায় তোরা খুব চিন্তা করছিলি?'

'আমি আর ঝুমু বাদে সবাই চিন্তা করছিল।'

'তোরা চিন্তা করিস নি?

'না। তুমি যদি রাতে না ফিরতে তাহলে আজ সকালে আমি আর ঝুমু পালিয়ে যেতাম।'

'কোথায়?'

ঝুমু কিছু বলল না, হাসতে লাগল। লিলি শংকিত গলায় আবার বলল, কোথায় পালাতি?

ঝুমু হাসছে। মাটির দিকে তাকিয়ে হাসছে। সে অনেক কথা বলে ফেলেছে। আর বোধ হয় কিছু বলবে না। লিলিকে অবাক করে দিয়ে ঝুমু আবারও কথা বলল, তবে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে।

'মা কাল তোমার জন্যে খুব মার খেয়েছে।

'মা মার খেয়েছে?'

মা তোমাকে বাঁচাবার জন্যে বলেছিল সে-ই তোমাকে ইউনিভার্সিটিতে যেতে বলেছে বলে তুমি গেছ। আর তাতেই বাবার মাথায় আগুন ধরে গেল। কিল চড় ঘুষি, ভয়ংকর ব্যাপার। তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না।

'তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলি?'

'হুঁ।'

'মাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলি না?'

'না।'

'আশ্চর্য, তোরা চুপ করে দেখলি?'

ঝুমু আবার হাসল। লিলি তীব্র গলায় বলল, 'তুই হাসছিস?'

ঝুমু বলল, তখন একটা মজার কাণ্ড হল, আমাদের মতির মা বুয়া মাছ কাটা বটি হাতে

নিয়ে ছুটে গেল। চিৎকার করে বলল, আম্মারে ছাড়েন। না ছাড়লে বটি দিয়া কল্লা নামাইয়া ফেলমু। তখন বাবা মা'কে ছেড়ে দিল।

'অনেক কাণ্ড তাহলে হয়েছে?'

'হুঁ। আরও অনেক কাণ্ড হবে।'

'কি হবে?'

'তোমার বিয়ে হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে হবে। বাবা আর বড় চাচা মিলে ঠিক করেছে।'

'কার সঙ্গে হবে?'

'সেটা পুরোপুরি ঠিক হয়নি। বাবার এক বন্ধুর ছেলে আছে। পুরানো ঢাকায় মোটর পার্টস এর দোকান। আজ সন্ধ্যাবেলা সে আসবে। বড় চাচা তার ইন্টারভ্যু নেবেন।'

লিলি বিস্ময় নিয়ে ঝুমুর কথা শুনছে। কথার বিষয়বস্তুর চেয়েও ঝুমুর কথা বলার উৎসাহ দেখেই সে বেশি অবাক হচ্ছে। লিলি বলল, 'তুই হঠাৎ এত কথা বলা শুরু করলি ব্যাপারটা কি? তুই একাই কথা বলা শুরু করেছিস না রমুও শুরু করেছে?'

ঝুমু আবারও হাসল।

লিলি বলল, 'রমু কোথায়?'

'স্যারের কাছে পড়ছে। আপা তোমার চা খাওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে চল, বাবা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে বাবা আজ অফিসে যান নি।'

'আচ্ছা তুই যা আমি আসছি।'

লিলি দাঁত মাজল। হাত মুখ ধুল, চুল আঁচড়ালো। কি মনে করে শাড়িও পাল্টাল। তার ঘর থেকে বাবার ঘরে যেতে হলে বড় চাচার ঘরের সামনে দিয়ে যেতে হয়। এই প্রথম বড় চাচার ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি বললেন না– কে যায়, লিলি না? একটু শুনে যা তো।

নেয়ামত সাহেব খবরের কাগজ নামিয়ে রাখলেন, চশমা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, 'বোস।' লিলি বসল এবং বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল চোখ নামিয়ে নিল না। নেয়ামত সাহেব সিগারেট ধরালেন।

'তুই কাল কোথায় গিয়েছিলি।'

'ইউনিভার্সিটিতে।'

'তারপর কোথায় গিয়েছিলি?'

'একটা বাসায় গিয়েছিলাম। কলাবাগানে।'

'তোর কোন বান্ধবীর বাড়িতে?'

'না।'

'তাহলে কার বাড়িতে?'

'হাসনাত সাহেব নামে একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে।'

'উনি কি করেন?'

'উনি একজন পেইন্টার। ছবি আঁকেন।'

'ঐ বাড়িতে আর কে কে থাকে?'

'উনি একাই থাকেন। মাঝে মাঝে তাঁর মেয়ে এসে থাকে।'

'তাঁর স্ত্রী কোথায়?'

'বোধ হয় মারা গেছেন।'

'বোধ হয় বলছিস কেন?'

'ওনার মেয়েটা বলছিল মারা গেছেন। আমার তা মনে হয়নি। আমার মনে হয়েছে ভদ্রলোক ডিভোর্সড।'

'তুই কি প্রায়ই ঐ বাড়িতে যাস?'

'আগে একবার গিয়েছিলাম।'

'তোর মা বলছিল অন্য কার একটা শাড়ি পরে তুই ফিরেছিস।'

'বৃষ্টিতে শাড়ি ভিজে গিয়েছিল সে জন্যে বদলেছি।'

নেয়ামত সাহেব চুপ করে আছেন। লিলি অবাক হয়ে লক্ষ্য করল– বাবা এখন আর তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছেন না। চোখ নামিয়ে নিচ্ছেন। তার হাতের সিগারেট অনেক আগেই নিভে গেছে। তিনি নেভা সিগারেটেই টান দিচ্ছেন। লিলি বলল, 'বাবা সিগারেট নিভে গেছে।'

নেয়ামত সাহেব লিলির এই কথাতেও চমকালেন। সিগারেট ধরালেন না। নেভা সিগারেটে আবার টান দিলেন। লিলি বলল, 'বাবা আমি যাই।'

নেয়ামত সাহেব হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। লিলি বাবার সামনে থেকে উঠে এল। তিনি অদ্ভুত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

লিলির খিদে পেয়েছে। নাশতার জন্যে নীচে নামতে তার ইচ্ছা করছে না। সে ছাদে উঠে গেল। ছোট চাচার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। সহজভাবে কিছুক্ষণ কথা বলবে। হাসি তামাশা করবে।

জাহেদুর রহমান জুতা পালিশ করছিল। সে লিলির দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলল, 'তোর জন্য কাল আমার যন্ত্রণা হয়েছে। রাত দুপুরে খাসি কিনতে গেছি আমিন বাজার। ঠেলে ঠুলে দু'টাকে বেবি টেক্সিতে তুললাম। এরা সারাপথ কি চিৎকার যে করেছে। ভাবটা এ রকম যেন আমি এদের চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি। পিঠে আদর করি, গলা চুলকে দেই– কিছুতেই কিছু হয় না– ভ্যা ভ্যা। সায়েন্স ল্যাবরেটরীর মোড়ের পুলিশ বক্সের কাছে পুলিশ ধরল।'

'কেন?'

'আমারও প্রশ্ন, কেন? আমি তো ইন্ডিয়ান গরু স্মাগল করে আনি নি। আমি এনেছি খাঁটি বঙ্গদেশীয় ছাগল।'

'তারপর?'

'আমি যে নগদ পয়সায় ছাগল কিনেছি পুলিশ বিশ্বাস করে না। বলে রশিদ দেখান। আরে ছাগলের আবার রশিদ কি? এটা টিভি যে রশিদ নিয়ে আসব লাইসেন্স করাতে হবে বলে।'

'শেষে কি করলে?'

'পান খাওয়ার জন্যে পঞ্চাশটা টাকা ধরে দিলাম। আর মনে মনে তোকে এক লক্ষ গালি দিলাম। কাল তুই কোথায় ছিলি? বান্ধবীর বাড়ি লুকিয়ে ছিলি?'

লিলি হাসল।

জাহেদুর রহমান বলল, 'আমিও ভাইজানকে তাই বললাম। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়ের দৌড় হল বান্ধবীর বাড়ি পর্যন্ত। ভাইজান আমার কথা বিশ্বাস

করল না– এমন হৈ চৈ।'

'তোমার আমেরিকা যাবার নতুন কিছু হয়েছে?'

'বৃহস্পতিবার আবার ইন্টারভ্যু দিচ্ছি। মরমন পাদ্রী কথা দিয়েছে সাহায্য করবে। কাকে নাকি বলে দেবে।'

'তুমি কি খ্রীশ্চান হয়ে গেছ?'

'এখনো হইনি। ব্যাটার নাকের সামনে মুলা ঝুলিয়ে রেখেছি। একবার খ্রীশ্চান হয়ে গেলে তো আর পাত্তা দেবে না। ঠিক না?'

'হুঁ।'

'দেশ ছেড়ে দেবার এখন হাই টাইম। ভেরি হাই টাইম।'

'কেন?'

'খবর কিছু জানিস না?'

'না।'

'বড় ভাইজান ভোম মেরে বসে আছে সেটা দেখেও কিছু বুঝতে পারছিস না?'

'না।'

'আমাদের সৎ মা দি গ্রেট লেডি মোসাম্মত আফরোজা বেগম যার নামে আমাদের এই বাড়ি 'রহিমা কুঠির' তিনি তাঁর বাড়ি ফেরত চেয়েছেন।'

'তাই না–কি?'

'হ্যাঁ। মুখের কথায় চাওয়া না– উকিলের চিঠি ফিঠি পাঠিয়ে বেড়াছেড়া। বড় ভাইজানের প্যালপিটিশন শুরু হয়ে গেছে। ক্রমাগত ঠান্ডা পানি খাচ্ছে, আর বাথরুমে যাচ্ছে।'

'আমাদের এখন হবে কি?'

'হবে আবার কি?' তোরা কমলাপুর রেল স্টেশনের প্ল্যাটফরমে শুয়ে থাকবি।'

'তুমি মনে হচ্ছে ব্যাপারটায় খুশি?'

'আমার অখুশি হবার কি আছে। আমি তো আর দেশে থাকছি না। তুইও থাকছিস না।'

'আমি যাব কোথায়?'

'তোর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না? কে না–কি আজ সন্ধ্যায় তোকে দেখতে আসবে। মেয়ে হয়ে জন্মানোর ডিসএ্যাডভানটেজ যেমন আছে, এ্যাডভানটেজও আছে। বিপদের সময় অন্যের গলা ধরে ঝুলে পড়ার সুযোগ আছে।'

জাহেদুর রহমান এখন বেগে জুতা ব্রাশ করছে। বৃহস্পতিবারের ভিসা ইন্টারভ্যুর প্রস্তুতি।

সন্ধ্যাবেলা গোঁফওয়ালা এক ছেলে সত্যি সত্যি বাসায় এসে উপস্থিত। তার গা দিয়ে সেন্টের গন্ধ বেরুচ্ছে। বর্তমান কালের স্টাইলে সার্টের সামনের দু'টা বোতাম খোলা। শরীরের তুলনায় তার মাথাটা ছোট এবং মনে হয় স্প্রীং বসানো। সারাক্ষণ এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

ফরিদা সেমাই রান্না করতে বসেছেন। মতির মাকে টাকা দিয়ে পাঠানো হয়েছে মিষ্টি আনতে।

লিলি এসে মা'র পাশে দাঁড়াল। সহজ গলায় বলল, 'মা ছেলেটাকে দেখেছ?'

ফরিদা চোখ না তুলেই বললেন, 'হুঁ।'

'ছেলেটাকে তোমার কেমন লাগছে মা?'

'ভালোই তো।'

'বেশ ভালো না মোটামুটি ভাল?'

'বেশ ভাল তবে–চোখ দু'টা ভাল না। রুমু ঝুমুর মাষ্টারের মত। শকুন শকুন চোখ।'

'তার জন্যে চা নিয়ে কি আমাকে যেতে হবে?'

'হুঁ।'

'এই শাড়ি পরে যাব না ভাল কোন শাড়ি পরব?'

'সবুজ শাড়িটা পর। রুমুকে বল চুল বেণী করে দিতে।'

'আচ্ছা।'

লিলি বলল, 'মা তোমার কাছে মনে হচ্ছে না, ছেলেটার মাথা শরীরের তুলনায় ছোট?'

ফরিদা চুলায় ডেগচি বসাতে বসাতে বললেন, 'ভারী জামা কাপড় পরেছে তো– এই জন্যে মাথাটা ছোট লাগছে। পায়জামা পাঞ্জাবি পরলে দেখবি মাথা ঠিকই লাগছে।'

লিলি হাসছে। খিলখিল করে হাসছে। ফরিদা লিলির হাসির কারণ ঠিক ধরতে পারছেন না।

হাসনাত সকাল থেকেই স্টুডিওতে। দুপুরে কিছুক্ষণের জন্যে বের হয়েছিল। প্যাকেট করে স্যান্ডউইচ এবং দড়িতে বেঁধে এক ডজন কলা নিয়ে ফিরেছে। জাহিনকে বলেছে, মা খেয়ে নাও তো। রাতে আমরা খুব ভাল কোন জায়গায় খাব। হোটেল সোনার গাঁ কিংবা শেরাটন এই জাতীয় জায়গায়। বলেই সে অপেক্ষা করেনি, স্টুডিওতে ঢুকে পড়েছে। জাহিন স্টুডিওর দরজা ধরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, বাবা তুমি কিছু খাবে না। হাসনাত কিছু বলল না। কিন্তু তাকাল বিরক্ত মুখে। যে বিরক্তির অর্থ– খবর্দার আর ডাকাডাকি করবে না।

গভীর মনোযোগে হাসনাত কাজ করছে। ব্রাশের কাজ শুরু হয়েছে। একটাই রঙ ব্যবহার করা হবে– নীল। নীলের সঙ্গে শাদা মিশিয়ে নানান ধরনের শেড। ছবির বিষয়বস্তু সাধারণ– ছাদে শাড়ি শুকাতে দিয়েছে একটা মেয়ে। দড়িতে শাড়ি মেলছে। ভেজা শাড়ি থেকে পানি চুঁইয়ে পড়ছে। তার দৃষ্টি আকাশের দিকে যে আকাশ ঘন নীল। রঙের ধর্ম হল– রঙ এক জায়গায় স্থির থাকে না, ছড়িয়ে পড়ে। আকাশের নীল ছড়িয়ে পড়েছে ছাদে, ভেজা শাড়িতে, শাড়ির পা থেকে গড়িয়ে পড়া পানির ধারায়। রঙকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়ার এই প্রক্রিয়াটিই সবচে জটিল প্রক্রিয়া। সমস্ত ইন্দ্রিয় এই প্রক্রিয়ার সময় সূঁচের মত তীক্ষ্ণ করে রাখতে হয়। সাধকের একাগ্রতা তখনি প্রয়োজন হয়।

হাসনাত হাজার চেষ্টা করেও মন বসাতে পারছে না। বার বার সুতা কেটে যাচ্ছে। যদিও তার আপাতত কোন কারণ নেই। জাহিন বিরক্ত করছে না। সে ঘরে আছে কি ঘরে নেই তাও বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে গল্পের বই নিয়ে মগ্ন। স্টুডিওর দরজা জানালা বন্ধ। বাইরের আওয়াজ কানে আসছে না। ইজেলের উপর আট শ' ওয়াটের আলো ফেলা হয়েছে। তেমন আলো হয়নি, ঘর গরম হয়ে গেছে।

হাসনাত সার্ট খুলে ফেলল। গরমের কারণেই কি বার বার তার একাগ্রতায় বাধা পড়ছে না–কি অন্য কিছু। স্টুডিওতে ফ্যান নেই। ফ্যানের শব্দে তার অসুবিধা হয়। তাছাড়া ফ্যান রঙে মেশানো তার্পিন তেল দ্রুত উড়িয়ে নেয়। এই ঘরে দামী একটা এয়ার কুলার ফিট করা থাকলে ভাল হত। ঘরটা এস্কিমোদের ইগলুর মত ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে। সেই হিম হিম পরিবেশে সে কাজ করবে। হাত চলবে যন্ত্রের মত। আজ হাত চলছে না। মনে হচ্ছে হাতের মাংস পেশীতে টান পড়ছে। এক শ মিটার দৌড়ের শেষ মাথায় যখন কোন খেলোয়াড়ের পায়ের মাংসপেশীতে টান পড়ে, দু'হাতে পা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ে, সে তাকায় অবিশ্বাসের

দৃষ্টিতে। হাসনাত এখন ঠিক সেই দৃষ্টিতেই তার হাতের দিকে তাকাচ্ছে।

'বাবা!'

হাসনাত হাতের ব্রাশ নামিয়ে রেখে মেয়ের দিকে তাকাল। তার মুখের দিকে তাকাল না, তাকাল পায়ের দিকে। মুখের দিকে তাকালে মেয়েটা মন খারাপ করবে। সে তার বাবার রাগ বুঝে ফেলবে। হাসনাত বলল, 'স্যান্ডউইচ খেয়েছ মা?'

'না।'

'খেলে না কেন? ভাল হয় নি?'

'আমার খেতে ইচ্ছা করছে না বাবা।'

'একটা কলা খাও।'

'কলা খেতেও ইচ্ছে করছে না।'

'তাহলে শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়। ঠিক যখন পাঁচটা বাজবে, আমাকে ডেকে দেবে।'

'পাঁচটা তো বাজে।'

'পাঁচটা বাজে, বল কি? তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নাও। খুব তাড়াতাড়ি। আমরা একজায়গায় বেড়াতে যাব। তারপর রাতে বাইরে খাব। খাওয়া দাওয়া শেষ হবার পর ফেরার পথে আইসক্রীম কিনে দেব।'

'আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না বাবা। শরীর খারাপ লাগছে।'

'যখন বেড়াতে যাব তখন আর শরীর খারাপ লাগবে না। মন খারাপ থাকলেই শরীর খারাপ হয়। মন যখন ভাল হবে তখন আপনা আপনি শরীর ভাল হবে।'

'বাবা, একজন ভদ্রলোক এসেছেন। আমি তাঁকে বারান্দায় চেয়ারে বসিয়ে রেখেছি।'

'ভাল করেছ। দাঁড়াও তার সঙ্গে কথা বলছি। তুমি তৈরি হয়ে নাও তো মা। তোমার যে পরী পরী ধরনের সাদা ফ্রকটা আছে ঐটা পর।'

'আমার একদম যেতে ইচ্ছা করছে না বাবা।'

'কাপড় পর, তারপর দেখবে যেতে ইচ্ছা করবে।'

জাহিন দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। হাসনাত সার্ট গায়ে দিয়ে উঠে এল, মেয়ের হাত ধরে সে প্রায় হতভম্ব হয়ে গেল। জ্বরে জাহিনের গা প্রায় পুড়ে যাচ্ছে। এত জ্বর নিয়ে মেয়েটা যে তার সঙ্গে কথা বলছে, সহজভাবে দাঁড়িয়ে আছে, এটাই একটা বিস্ময়কর ঘটনা।

'মা, তোমার শরীর তো খুবই খারাপ।'

'হুঁ।'

'এসো শুইয়ে দি।'

হাসনাত কোলে করে মেয়েকে নিয়ে শুইয়ে দিল। ওয়ারড্রোব খুলে মেয়ের গায়ে কম্বল দিল। জ্বর কমানোর জন্যে মেয়েকে এনালজেসিক কিছু খাওয়ানো দরকার। ফার্মেসী থেকে নিয়ে আসতে হবে। সোনার গাঁ হোটেলের এপয়েন্টমেন্টটা কিছুতেই মিস করা যাবে না। হাসনাত কি করবে ধাঁধায় পড়ে গেল। জাহিন বলল, 'বাবা একজন ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে বারান্দায় বসে আছেন।'

'আচ্ছা আমি ওনাকে বিদায় করে আসছি। তোমার হুট করে এত জ্বর উঠে গেল কি ভাবে।' জাহিন হাসলো। লজ্জার হাসি। যেন হুট করে জ্বর ওঠায় সে খুব বিব্রত ও লজ্জিত।

বারান্দায় যিনি বসে আছেন হাসনাত তাকে চিনল না। সার্ট পোষাকের এক ভদ্রলোক,

তবে গলায় সোনার চেইন চক চক করছে। সোনার চেইনের কারণে যে ভদ্রলোকের সব স্মার্টনেস ধুয়ে মুছে গেছে তা তিনি জানেন না।

'আপনাকে আমি চিনতে পারছি না।'

'আমার নাম জাহেদুর রহমান। আমি লিলির ছোট চাচা।'

'কিছু মনে করবেন না। আমি এখনো চিনতে পারছি না।'

'লিলি! ও আপনার এখানে এসেছিল। একটা শাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। ফেরত পাঠিয়েছে আর জাহিনের জন্যে একটা গল্পের বই পাঠিয়েছে।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা, লিলি। আমার মেয়েটার হঠাৎ খুব জ্বর এসেছে। আমার নিজের মাথা গেছে এলোমেলো হয়ে। প্লীজ কিছু মনে করবেন না। প্লীজ।'

'না না, মনে করব কি? জ্বর কত?'

'জ্বর যে কত তাও তো বলতে পারছি না। ঘরে থার্মোমিটার নেই।'

'আমি কি একটা থার্মোমিটার কিনে নিয়ে আসব?'

হাসনাত জাহেদুর রহমানের দিকে তাকিয়ে আছে। গলায় সোনার চেইনের কারণে শুরুতে ভদ্রলোককে যতটা খারাপ লাগছিল এখন ততটা খারাপ লাগছে না। মানুষের চেহারা তার আচার আচরণের উপরও নির্ভরশীল। চিত্রকর ছবিতে চেহারা ধরতে পারেন। আচার আচরণ ধরতে পারেন না। সবাই যে পারেন না, তা না। মহান চিত্রকরদের কাউকে কাউকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

জাহেদুর রহমান বলল, 'একটা থার্মোমিটার আর জ্বর কমাবার জন্যে প্যারাসিটামল সিরাপ জাতীয় কিছু নিয়ে আসি।'

হাসনাত বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'এনে দিলে খুব ভাল হয়। সো কাইন্ড অব ইউ। একটু দাঁড়ান আমি আপনাকে টাকা এনে দিচ্ছি।।'

'টাকা পরে দেবেন।'

জাহেদুর রহমান ব্যস্ত ভঙ্গিতে বের হয়ে গেল।

জ্বর একশ' তিন পয়েন্ট পাঁচ।

হাসনাতের মুখ শুকিয়ে গেল। জাহেদুর রহমান বলল, 'আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের একশ' তিন চার জ্বর কোন জ্বরই না। অষুধ খাওয়ানো হয়েছে। এক্ষুনি একশান শুরু হবে। মাথায় পানি ঢালতে হবে। নন স্টপ পানি ঢেলে জ্বর যদি আধ ঘন্টার মধ্যে একশ'তে নামিয়ে আনতে না পারি তাহলে আমার নাম জাহেদুর রহমান না, আমার নাম হামেদুর রহমান। বালতি কোথায় বলুন দেখি? রাবার জগ আছে? না থাকলে নাই। নো প্রবলেম, ব্যবস্থা করছি।'

হাসনাত অবাক হয়ে দেখল এই নিতান্ত অপরিচিত ভদ্রলোক নিজেই ছোটাছুটি করে পানি ঢালার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তার মধ্যে কোন রকম দ্বিধা নেই। কৃতজ্ঞতা সূচক কিছু এই ভদ্রলোককে বলা উচিত। হাসনাতের মুখে কোন কথা আসছে না। না আসাই ভাল। এই জাতীয় মানুষ কৃতজ্ঞতা সূচক কিছু শোনার জন্যে কাজ করে না।

হাসনাত মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন কেমন লাগছে মা?'

'এখন ভাল লাগছে। বাবা, তোমার না কোথায় যাবার কথা।'

'তোকে এই ভাবে রেখে যাব কি ভাবে?'

'উনি তো আছেন। তোমার জরুরি কাজ, তুমি যাও।'

জাহেদুর রহমান বলল, 'সিরিয়াস জরুরি কাজ থাকলে কাজ সেরে আসুন। আমি আছি। জ্বর নিয়ে চিন্তা করবেন না। জ্বর এর মধ্যে দুই ডিগ্রী নামিয়ে ফেলেছি। আরো নামাব। মাপুন তো দেখি জ্বরটা আরেক বার।'

আবার জ্বর মাপা হল। সত্যি সত্যি জ্বর দু'ডিগ্রী নেমে গেছে। এখন একশ' এক পয়েন্ট পাঁচ।

হাসনাত লজ্জিত গলায় বলল, 'আপনার কাছে মেয়েটাকে রেখে এক ঘন্টার জন্যে কি যাব? আমার যাওয়া খুব জরুরি। একজন অপেক্ষা করে থাকবে। রাতে ডিনারের নিমন্ত্রণও ছিল। ডিনার টিনার না, আমি শুধু খবরটা দিয়ে চলে আসব।

'আপনি চলে যান। মেয়েকে নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।' তারপরেও হাসনাত ইতস্তত করছে। জাহিন বলল, 'বাবা তুমি যাও। আমি ওনার সঙ্গে গল্প করব। আমার কোন অসুবিধা হবে না।

হাসনাত খুব মন খারাপ করে বের হল।

জাহিন বলল, 'আপনার নিশ্চয়ই পানি ঢালতে ঢালতে হাত ব্যথা হয়ে গেছে। হয়নি?'

'উহুঁ।'

'আর পানি ঢালতে হবে না। আমার জ্বর এখন কমে গেছে।'

'আরও দশ মিনিট পানি ঢালব তারপর রেস্ট নেব। তোমার মা কোথায় গেছেন?'

জাহিন লজ্জিত স্বরে বলল, 'আমি যখন ছোট তখন মা মারা গেছেন।'

জাহেদুর রহমান প্রশ্নটা করে লজ্জায় পড়ে গেল। ঘটনা এ রকম জানলে সে এই প্রশ্ন করত না।

জাহিনের চোখে এই মানুষটার অস্বস্তি ধরা পড়েছে। জাহিনেরও খারাপ লাগছে। জাহিন বলল, 'সত্যি কথাটা আপনাকে বলি– মা আসলে বেঁচেই আছে। বাবার সঙ্গে রাগ করে মা আমাকে ফেলে চলে গিয়েছিল। অন্য একটা লোকের সঙ্গে গিয়েছিল। এটা তো খুব লজ্জার ব্যাপার এই জন্যে মা'র কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে আমরা দু'জনই মিথ্যা কথা বলি। বাবা যখন মিথ্যা বলে তখন বাবার পাপ হয়। বড়দের মিথ্যা বললে পাপ হয়। আমি যখন মিথ্যা বলি তখন পাপ হয় না। তবে পাপ না হলেও যখন মিথ্যা করে বলি মা মারা গেছে, তখন খুব কষ্ট হয়।'

জাহেদুর রহমানের চোখে পানি চলে এসেছে। সে চোখের পানি আড়াল করার জন্যে মাথায় পানি ঢালা বন্ধ রেখে বারান্দায় চলে গেল।

সব জায়গায় সব পোষাকে যাওয়া যায় না। গ্রামের হাটে থ্রি পিস স্যুট পরে হাঁটলে নিজেকে সঙ এর মত লাগবে। আবার সোনার গাঁ হোটেলে আধ ময়লা সার্ট যার অর্ধেকটা ভেজা এবং বুকের কাছে নীল রং লেগে আছে) বেমানান। হাসনাত লক্ষ্য করল সবাই তাকে দেখছে। ভুরু কুঁচকাচ্ছে না, কারণ সভ্য মানুষ ভুরু কুঁচকায় না। কুঁচকালেও তা চোখে পড়ে না।

হোটেলের রিসেপশনিষ্ট অবশ্যি স্পষ্টতই ভুরু কুঁচকালো। প্রায় অভদ্রের মতই বলল, 'কাকে চান?'

'রুবি। রুবি হক। রুম নং তিনশ চার।'

'এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

'আছে।'

'দাঁড়ান, জিজ্ঞেস করে দেখি।'

জিজ্ঞেস করে দেখি বলেও সে দেখছে না। হাতের কাজ সারছে। ভেজা সার্টের একটা মানুষকে অপেক্ষা করানো যায়। এক সময় রিসেপশনিস্টের দয়া হল। ইন্টারকমে জিজ্ঞেস করল।

'যান, সিঁড়ি দিয়ে চলে যান। সেকেন্ড ফ্লোর। ম্যাডাম যেতে বলেছেন।'

'ধন্যবাদ।'

রিসেপশনিষ্ট ধন্যবাদের জবাব দিল না। বড় হোটেলের কর্মচারীদের এটিকেট শেখার জন্যে দীর্ঘ ট্রেনিং নিতে হয়। তবে সেই এটিকেট সবার জন্যে না।

ডোর বেলে হাত রাখতেই ভেতর থেকে শুদ্ধ এবং পরিষ্কার ইংরেজিতে বলা হল, Door is open, come in please. হাসনাত ঘরে ঢুকল। রুবি চেয়ারে বসেছিল। সে উঠে দাঁড়াল। শান্ত গলায় বলল, 'এসো ভেতরে এসো। জাহিন কোথায়?'

'ও আসেনি। শরীর ভাল না। জ্বর।'

'আমার তো মনে হচ্ছে ইচ্ছে করেই আননি।'

হাসনাত শান্ত গলায় বলল, 'রুবি, আমি কখনো ট্রিকস করি না।'

'সরি, I know that. বোস।'

রুবিকে দেখে চমকের মত লাগছে। তার চেহারা পাল্টে গেছে। খাড়া নাক। ঠোঁটের কোথায় যেন কি একটা পরিবর্তন হয়েছে, সূক্ষ্ম পরিবর্তন। যেহেতু পরিবর্তনটা ঠোঁটে সেহেতু ছোট পরিবর্তনও বড় হয়ে চোখে লাগছে। শাড়ি পরেছে। সেই শাড়ি পরাটাতেও কিছু আছে। ঠিক বাঙালি মেয়ের শাড়ি পরা বলে মনে হচ্ছে না।

রুবি বলল, 'কি দেখছ?'

'তোমাকে চেনা যাচ্ছে না।'

'ছোট দু'টা প্লাস্টিক সার্জারী করিয়েছি। চেহারা আগের চেয়ে সুন্দর হয়েছে, না? তুমি আর্টিষ্ট মানুষ তোমার তো আগে ভাগে ধরতে পারার কথা।'

'তোমার আগের চেহারাটাও খারাপ ছিল না।'

'খুব ভালও ছিল না। তুমি তো প্রায়ই বলতে ভোতা ধরনের চেহারা। এখন আর নিশ্চয়ই তা বলবে না।'

'না, তা বলব না।'

'আরাম করে বোস। তুমি এমন ভাবে বসেছ– মনে হচ্ছে আমার কাছে ইন্টারভ্যু দিতে এসেছ।'

হাসনাত লক্ষ্য করল রুবি জড়ানো স্বরে কথা বলছে। বিকেলে কেউ মদ্যপান করে না। মেয়েরা তো নয়ই। রুবি কি ইচ্ছে করেই প্রচুর মদ্যপান করে তার জন্যে অপেক্ষা করছে?

হাসনাত সহজ ভঙ্গিতেই বলল, 'তুমি দেশে কতদিন থাকবে?'

'এক সপ্তাহ। এক সপ্তাহের মধ্যে চার দিন পার হয়ে গেছে, আছে মাত্র তিন দিন।'

'এখান থেকে যাবে কোথায়?'

'যেখান থেকে এসেছি সেখানে যাব। আর কোথায় যাব? সানফ্রান্সিসকো। শুধু শুধু এই প্রশ্ন করার মানে কি?'

'তুমি তো নামী দামী মানুষ, সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াও। এই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি।'

'ঠাট্টা করছ?'

'না, ঠাট্টা করছি না। আমি অনেক জিনিস পারি না– ঠাট্টা হচ্ছে তার মধ্যে একটা। 'তোমার নাচের ট্রুপের অবস্থা কি?'

'অবস্থা ভাল। দেশে দেশে নেচে বেড়াচ্ছি। এবার দু'টি শিল্পী মেয়ে দলে এসেছে। অসাধারণ। কি যে অপূর্ব নাচে তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না।'

'তোমার চেয়েও ভাল?'

'হ্যাঁ, আমার চেয়েও ভাল।'

'ফারুক কেমন আছে?'

'ভাল। ও প্রায়ই তোমার কথা বলে।'

হাসনাত হাসল। রুবি বলল, 'তুমি ময়লা এবং ভেজা সার্ট পরে এসেছ? ময়লা সার্টের একটা কারণ থাকতে পারে লন্ড্রিতে পাঠানোর পয়সা নেই। সার্ট ভেজার কারণটা বুঝলাম না।'

'জাহিনের মাথায় পানি ঢালছিলাম। সার্ট ভিজে গিয়েছে খেয়াল করিনি।'

'ওর মাথায় পানি ঢালতে হচ্ছে কেন?'

'তোমাকে শুরুতেই বলেছি ওর জ্বর। তুমি খেয়াল করনি।'

রুবি উঠে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'চল আমি ওকে দেখতে যাব।'

হাসনাত বলল, 'তুমি আজ যেও না। অন্য কোন সময় যেও।'

'আজ গেলে অসুবিধা কি?'

'তুমি প্রচুর মদ্যপান করেছ। তোমার পা টলছে। আজ না যাওয়াই ভাল।'

রুবি বসে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমি কেন দেশে এসেছি তোমাকে বলা হয় নি। আমি জাহিনকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

রুবি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল।

হাসনাত বলল, 'কাঁদছ কেন? আমি তো বলিনি তুমি ওকে নিয়ে যেতে পারবে না।'

'আমি অন্য কারণে কাঁদছি। তোমার সঙ্গে শুয়ে শুয়ে আমি তারা দেখতাম। তোমার মনে আছে? এক সময় আকাশের তারাগুলি চোখের সামনে নেমে আসত। মনে আছে?'

'আছে।'

'আমি গত বার বছর ধরে তারা নামিয়ে আনতে চেষ্টা করছি, পারছি না।'

রুবি কাঁদছে। হাসনাত চুপচাপ বসে আছে। তার একবার ইচ্ছা হল এগিয়ে গিয়ে রুবির মাথায় হাত রাখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই পারল না। বাসায় ফেরা দরকার। জাহিন একা আছে। তার জ্বর কমেছে কি না কে জানে।

'রুবি, আমি উঠি?'

'বোস, একটু বোস।'

'জাহিনের জ্বর।'

'জানি জ্বর। তুমি ইতিমধ্যে দু'বার বলে ফেলেছ। বোস, একটু বোস। প্লীজ।'

হাসনাত বসল। রুবি বলল, 'তুমি বুড়ো হয়ে গেছ কেন?'

'বয়স হয়েছে। এই জন্যে বুড়ো হচ্ছি।'

'না, তুমি বয়সের চেয়েও বুড়ো হয়েছ। ছবি আঁকছ?'

'হ্যাঁ।'

'এখনো কি তোমার ধারণা তুমি ছবিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পার?'

'হ্যাঁ, পারি।'

'তুমি পার না। তোমার সেই ক্ষমতা নেই। যে জীবন্ত মানুষের প্রাণ নষ্ট করে দেয়, সে ছবিতে প্রাণ আনবে কি করে? তুমি আমার জীবন পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছিলে।'

হাসনাত চুপ করে আছে। রুবি তীব্র গলায় বলল, 'নাচ ছিল আমার কাছে আমার জীবনের মত। তুমি কোনদিন আমাকে নাচতে দাওনি। তুমি আমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলেছিলে।'

'শিকল তো ভেঙেছ।'

'হ্যাঁ, শিকল ভেঙেছি। অবশ্যই ভেঙেছি।'

রুবির চোখ চক চক করছে। সে মনে হয় আবার কাঁদবে।

হাসনাত উঠে দাঁড়াল।

……

দুঃস্বপ্ন দেখে মানুষের যত ঘুম ভাঙে, সুন্দর স্বপ্ন দেখে বোধ হয় তারচে' বেশি ভাঙে। রওশন আরার ঘুম ভেঙেছে সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে তিনি নৌকায় করে কোথায় যেন যাচ্ছেন। তাঁর বয়স খুব অল্প। তাঁর পাশে লাজুক লাজুক চেহারার একজন যুবক। স্বপ্নে তিনি অবাক হয়ে টের পেলেন এই যুবকটি তাঁর স্বামী। তিনি লজ্জিত এবং বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। তার এই ভেবে কষ্ট হল যে তিনি এমন চমৎকার ছেলেটিকে ফেলে এতদিন কোথায় কোথায় ঘুরছিলেন। ইশ, খুব অন্যায় হয়েছে। যুবকটি তার গা ঘেসে বসতে চাচ্ছে কিন্তু লজ্জা পাচ্ছে। তিনি যুবকটিকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়ে তার গা ঘেঁসে বসার সুযোগ দেবার জন্যে বললেন- এই শোন, আমাকে একটা পদ্মফুল তুলে দাও না। নদীতে পদ্ম ফোটে না, কিন্তু স্বপ্নের নদীতে সব ফুল ফোটে। যুবকটি তার গা ঘেঁসে বসল। নদীতে ঝুঁকে পড়ে পদ্মফুল তুলতে লাগল। ছেলেটি যেন পড়ে না যায় এই জন্যে তিনি তার হাত ধরে রাখলেন। কি যে ভাল লাগল তার ধরে থাকতে। স্বপ্নের এই পর্যায়ে গাঢ় তৃপ্তিতে তাঁর ঘুম ভাঙল। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। নাজমুল সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কি হয়েছে?'

'কিছু না।'

তিনি খাট থেকে নামলেন। নাজমুল সাহেব বললেন, 'এক ফোঁটা ঘুম আসছে না। কি করি বল তো? দশটা থেকে শুয়ে আছি। এখন বাজছে তিনটা।'

রওশন আরা বললেন, 'বয়স হয়েছে, এখন তো ঘুম কমবেই। ঘুমের ওষুধ খাবে?'

'দাও।'

রওশন আরা স্বামীকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিলেন। তিনি বিছানায় ফিরে আসছেন না, বারান্দার দিকে যাচ্ছেন। নাজমুল সাহেব বললেন, 'যাচ্ছ কোথায়?' রওশন আরা নিচু গলায় বললেন, 'স্বাতীকে দেখে আসি।'

'রাত দুপুরে চুরি করে মেয়ের ঘরে ঢোকা ঠিক না। প্রাইভেসির একটা ব্যাপার আছে। মা হলেই যে প্রাইভেসি নষ্ট করার অধিকার হয় তা কিন্তু না।'

রওশন আরা শীতল গলায় বললেন, 'এটা কোর্ট না। আইনের কচকচানি রাখ। ঘুমানোর চেষ্টা কর।'

রওশন আরা একটু আগে যে স্বপ্ন দেখেছেন বাস্তবের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। স্বপ্নের যুবকটি তাঁর পাশে এসে বসায় তিনি যে আনন্দ পেয়েছেন- পঁচিশ বছর এই মানুষটির সঙ্গে বাস করার সব আনন্দ যোগ করেও তার সমান হবে না। স্বপ্ন ও বাস্তব এত আলাদা কেন?

স্বাতীর ঘর অন্ধকার। সে গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েনি। মিউজিক সেন্টার নিঃশব্দ। রওশন আরা মেয়ের বিছানার দিকে চুপি চুপি এগুলেন। মেয়ের গায়ে চাদর আছে। আজ অবশ্যি গরম পড়েছে। গায়ে চাদর না থাকলেও চলত। মেয়েটা অদ্ভুত হয়েছে, যেদিন ঠান্ডা পড়ে সেদিন তার গায়ে চাদর থাকে না। গরমের সময় কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমায়। রওশন আরা ঘরের জানালার দিকে তাকালেন। জানালা খোলা। বৃষ্টি এলে খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাট আসবে। মেয়েটার বিছানাটা জানালা থেকে একটু সরিয়ে দিতে হবে। রোজ রাতেই একবার করে ভাবেন। দিনে মনে থাকে না।

তিনি ঘর ছেড়ে বেরুতে যাবেন তখন স্বাতী পাশ ফিরল। শান্ত গলায় বলল, 'মা তোমার ইন্সপেকশন শেষ হয়েছে?'

রওশন আরা লজ্জিত গলায় বললেন, 'তুই জেগে ছিলি?'

'তুমি যতবার এসেছ ততবারই আমার ঘুম ভেঙেছে। আমি ঘুমের ভান করে তোমার কীর্তিকলাপ দেখছি। আজ ঠিক করেছিলাম হাউ করে একটা চিৎকার দিয়ে তোমাকে ভয় দেখাব।'

রওশন আরা লজ্জিত গলায় বললেন, 'আমি যে রাতে এসে তোকে দেখে যাই তোর খুব রাগ লাগে, তাই না?'

'মাঝে মাঝে খুব রাগ লাগে, আবার মাঝে মাঝে এত ভাল লাগে যে বলার না।'

'আজ রাগ লাগছে না ভাল লাগছে?'

'খুব ভাল লাগছে। আজ আমার ঘুমই আসছিল না। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম কখন তুমি আসবে। মা, আমার পাশে এস বোস। তোমার যদি ঘুম না পেয়ে থাকে তাহলে আমার সঙ্গে গল্প কর।'

রওশন আরা মেয়ের বিছানায় বসলেন। স্বাতী বলল, 'পা তুলে আরাম করে বোস।'

রওশন আরা বললেন, 'বাতি জ্বালা। অন্ধকারে কি গল্প করব? মুখ না দেখে গল্প করে মজা নেই।'

'বাতি জ্বালাতে হবে না। অন্ধকারের গল্পের আলাদা মজা আছে। অন্ধকারে যত সহজে গল্প করা যায় আলোতে তত সহজে গল্প করা যায় না।'

'বেশ অন্ধকারেই তোর গল্প শুনি। কি গল্প বলবি?'

'শুধু আমি একা গল্প করব কেন? দু'জনে মিলে করব। আমি কিছুক্ষণ গল্প করব। তুমি কিছুক্ষণ করবে। লিলির মহা বিপদের গল্প শুনবে মা?'

'বল শুনি।'

'ওর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। আগামী শুক্রবার জুম্মা নামাজের পর পবিত্র শুভ বিবাহ।'

'এতে বিপদের কি হল। বিয়ের বয়স হয়েছে বিয়ে হবে এটাই তো স্বাভাবিক।'

'ওর বিয়েটা অবিশ্যি খুব স্বাভাবিক ভাবে হচ্ছে না। বাবা মা আত্মীয় স্বজন সবাই ধরে-বেঁধে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। লিলি যে খুব আপত্তি করছে তা না। দিব্যি মায়ের সঙ্গে গয়নার দোকানে গিয়ে গয়না অর্ডার দিয়ে এসেছে।'

'ভালই তো!'

'ঝটপট তার বিয়ে কেন দিয়ে দিচ্ছে জান মা?'

'না।'

'তার বাবা-মা'র ধারণা হয়েছে মেয়ে তাদের কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে। একদিন তাকে দেখা গেছে হলে তার বান্ধবীর সঙ্গে সিগারেট খাচ্ছে। তারপরে সে আরেকটা ভয়াবহ অন্যায় করল, নিষেধ সত্ত্বেও ইউনিভার্সিটিতে গেল। বাসায় ফিরল রাত দশটায়। এই গুরুতর অপরাধে তার শাস্তি হয়েছে যাবজ্জীবন স্বামীর হাতে বন্দি।'

'তোর কি ধারণা স্বামীরা বন্দি করে ফেলে?'

'সব স্বামী হয়ত করে না। তখন সংসার বন্দি করে ফেলে। ছেলে মেয়ে জন্মায়- তারা বন্দি করে ফেলে। আমার বন্দি হতে ইচ্ছে করে না।'

'তোকে তো আর কেউ জোর করে বন্দি করতে চাচ্ছে না। কাজেই দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তবে বন্দি জীবনেও আনন্দ আছে।'

স্বাতী শান্ত গলায় বলল, 'তুমি যে বাবার সঙ্গে বাস করছ, ধরাবাঁধা একটা জীবন যাপন করছ, রাঁধছ-খাচ্ছ-ঘুমুচ্ছ, আবার রান্না, আবারে খাওয়া, আবার ঘুমানো এই জীবনটা তোমার পছন্দের? আমার তো মনে হয় দারুণ একঘেঁয়ে একটা জীবন।'

'একঘেয়েমী তো সব জীবনেই আছে। তুই যদি একা বাস করিস, সেই একার জীবনেও তো একঘেয়েমী চলে আসবে।'

'দু'জনের জীবনের একঘেয়েমী অনেক বেশি। দু'জনেরটা এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একঘেয়েমী ভয়াবহ হয়ে যায়।'

'তোর যত অদ্ভুত কথা।'

'মোটেই অদ্ভুত কথা না। আমি খুব ইন্টারেস্টিং একটা জীবন চাই মা। আমি একা থাকব। কিন্তু আমার একটা সংসার থাকবে। আমার একটা মেয়ে থাকবে। মেয়েটাকে সম্পূর্ণ আমার মত করে আমি বড় করব। সে হবে আমার বন্ধুর মত। আমার মত স্মার্ট একটা মেয়ে সে হবে। খানিকটা জাহিনের মত।'

'জাহিন কে?'

স্বাতী একটু থতমত খেয়ে বলল, 'তুমি চিনবে না মা। একজন আর্টিস্টের মেয়ে।'

স্বাতী চুপ করে গেল। রওশন আরাও চুপ করে রইলেন। এক সময় তিনি নিচু গলায় বললেন, 'কোন আর্টিস্ট, যে তোর ছবি এঁকেছে?'

স্বাতী প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

রওশন আরা বললেন, 'তোর লুকিয়ে রাখা ছবিটা আমি দেখে ফেলেছি- এই জন্যে কি তুই রাগ করেছিস?'

'না। তুমি তালা খুলে আমার ঘরে ঢুকে আমার জিনিসপত্র নাড়াচাড়া কর- সেটা আমি জানি। ছবিটাও দেখবে তাও জানতাম। তোমার দেখার জন্যেই ছবিটা ঘরে রেখেছি। আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। তুমি ছবিটা দেখে আমার কাছে জানতে চাইবে- তখন পুরো ব্যাপারটা বলা আমার জন্য সহজ হবে। তুমি ছবি দেখেছ অথচ আমাকে কিছুই বলনি।'

'জাহিন ঐ ভদ্রলোকের মেয়ে?'

'হ্যাঁ, খুব চমৎকার একটা মেয়ে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি ঐ ভদ্রলোকের প্রেমে পড়িনি। মেয়েটার প্রেমে পড়েছি। এতক্ষণ যে মা-মেয়ের সংসারের গল্প করলাম এই ভেবেই বোধ হয় করেছি।'

'ভদ্রলোকের স্ত্রী আছেন?'

'না।'

'তুই কি তার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিস?'

'হুঁ।'

'খুব ঘনিষ্ঠভাবে?'

'হুঁ।'

রওশন আরা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। তার চোখ ভিজে উঠেছে। এখনি হয়ত চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়বে। ঘর অন্ধকার, মেয়ে দেখতে পাবে না। এই টুকুই যা সান্ত্বনা।

'মা তুমি কি আমাকে ঘেন্না করছ? আমার সঙ্গে এক বিছানায় বসে থাকতে তোমার কি ঘেন্না লাগছে?'

'তুই কি ঘেন্নার মত কোন কাজ করেছিস?'

'হ্যাঁ। মাঝে মাঝে মনে হয় খুব ঘেন্নার কাজ করে ফেলেছি। আবার মাঝে মাঝে মনে হয় না। মা, তুমি কি লক্ষ করেছ আমার শরীর খারাপ করেছে? কিছু খেতে পারছি না, ঠিকমত ঘুমুতে পারছি না।'

'লক্ষ করেছি।'

'ঘর অন্ধকার করে আমি তোমার সঙ্গে খুব সহজভাবে কথা বলছি। তুমি কিছু মনে কোর না। সহজভাবে কথা বলা ছাড়া আমার উপায় নেই। তুমি রাগ যা করার পরে কোর। এখন আমার কথা শোন।'

'শুনছি।'

'মা দেখ, ছেলে এবং মেয়ের ভালবাসাবাসি প্রকৃতি খুব সহজ করেনি। কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে। ভালবাসতে গেলেই কাঁটা ফুটবে। অথচ দেখ, মেয়ে এবং মেয়ের ভেতর কি চমৎকার বন্ধুত্ব হতে পারে। দু'জন মেয়ের ভেতর বন্ধুত্ব হতে পারে। দু'জন ছেলের ভেতর বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু যেই একটি ছেলে একটা মেয়ের কাছে যায় তাকে কাঁটা বিছানো পথে এগোতে হয়। কাঁটার কথা এক সময় মনে থাকে না- পায়ে তখন কাঁটা ফোটে।'

রওশন আরা ক্লান্ত গলায় বললেন, 'এত কাব্য করে কিছু বলার দরকার নেই যা বলার সহজ করে বল। নোংরা কোন ব্যাপার যত সুন্দর ভাষা দিয়েই বলা হোক সেটা নোংরাই থাকে। সুন্দর হয়ে যায় না।'

'মা প্লীজ, তুমি আমার কথাগুলি আমার মত করে বলতে দাও। প্লীজ। প্লীজ।'

'বল, কি বলতে চাস।'

'কাঁটার কথাটা বলছিলাম মা। কাঁটা যখন ফোটে তখন কাঁটাটাকে ফুল বানানোর জন্য আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠি। তড়িঘড়ি করে একটা বিয়ের ব্যবস্থা হয়। সবাই তখন ভান করতে থাকে কাঁটা ফুল হয়ে গেছে।'

'তুই কি ঠিক করেছিস বিয়ে করবি?'

'তাই ঠিক করা হল মা। কাঁটার ভয়ে ঠিক করা হল। তোমাদের না জানিয়ে বিয়ের সব ব্যবস্থা পাকা করা হয়ে গেল। তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা শুনে খুব অবাক হচ্ছ।'

'তুই তোর কথা বলে যা। আমি অবাক হচ্ছি কি হচ্ছি না, সেটা পরের ব্যাপার।'

'বিয়ের ঠিক আগের রাতে আমার ঘুম হচ্ছিল না, আমি ছটফট করছিলাম, তখন হঠাৎ মনে হল, এই বিয়েটা তো কোন আনন্দের বিয়ে না। সমস্যার বিয়ে। সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে বিয়ে। একদিন আমাদের সংসারে একটা শিশু আসবে। যতবার তার দিকে তাকাব ততবার মনে হবে সে সংসারে ঢুকেছিল কাঁটা হিসেবে। স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া হবে। হবে তো বটেই। তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মা, বাবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা, তোমরাই দু'জন দু'জনকে সহ্য করতে পার না। আমরা কি করে সহ্য করব। মা, কি হবে জান? কুৎসিৎ সব ঝগড়া হবে, দু'জন দু'জনের দিকে ঘৃণা নিয়ে তাকাব– সেই ঘৃণার সবটাই গিয়ে পড়বে আমার সন্তানের উপর। মনে হবে তার কারণেই আমরা ঘৃণার ভেতর বড় হচ্ছি। মা ঠিক করে বল তো, আমার সঙ্গে এক খাটে বসে থাকতে তোমার কি ঘেন্না লাগছে?'

'লাগছে।'

'লাগলেও আর একটুক্ষণ বোস। আমার কথা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কথা শেষ হলেই আমি তোমার জন্যে কফি বানিয়ে আনব।'

'স্বাতী, কথা অনেক শুনে ফেলেছি। আমার আর কিছু শুনতে ইচ্ছে করছে না।'

'শেষটা খুব ইন্টারেস্টিং মা। শেষটা তোমাকে শুনতেই হবে।'

'আমি অনেক বয়স পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে ঘুমাতাম। আমি হলাম খুব আদরের মেয়ে, নক্ষত্রের নামে নাম। বাবা মা'র সঙ্গে তো ঘুমুবই। আমি মাঝখানে তোমরা দু'জন দু'দিকে। একটা হাত রাখতে হত তোমার উপর একটা হাত রাখতে হত বাবার উপর। তোমার দিকে তাকিয়ে ঘুমুলে বাবা রাগ করতো, বাবার দিকে তাকিয়ে ঘুমুলে তুমি রাগ করতে। নকল রাগের মজার খেলার ভেতর দিয়ে আমি বড় হচ্ছি– চার বছর থেকে পাঁচ বছরে পড়লাম, তারপর প্রচণ্ড রকম ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আলাদা থাকার জন্যে, আলাদা ঘরের জন্যে। আমার প্রচণ্ড ভূতের ভয়, তারপরেও আলাদা থাকার জন্যে কি কান্না– তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। মনে আছে না মা?'

'হ্যাঁ, মনে আছে?'

'ভূতের ভয়ে কাতর ভীতু একটা মেয়ে আলাদা থাকার জন্যে কেন এত ব্যস্ত সেটা নিয়ে তোমরা কখনো মাথা ঘামাওনি। কারণ কখনো জানতে চাওনি। ধরেই নিয়েছ বাচ্চা মেয়ের খেয়াল। ব্যাপারটা কিন্তু তা না মা। তোমরা মাঝে মাঝে চাপা গলায় কুৎসিৎ ঝগড়া করতে। ঝগড়ার মূল কারণ ধরতে পারতাম না শুধু বুঝতাম রহস্যময় একটা ব্যাপার। তুমি বিয়ের আগে ভয়ংকর একটা অন্যায় করেছিলে। সে অন্যায় চাপা দিয়ে বাবাকে বিয়ে করেছ। প্রতারণা করেছ। লোক লজ্জার ভয়ে বাবা সেই অন্যায় হজম করেছেন। আবার হজম করতে পারছেনও না। পাঁচ বছরের একটা মেয়ের বাবা-মা'র ঝগড়া থেকে সেই অন্যায় ধরতে পারার কোন কারণ নেই। আমি ধরতে পারিনি। তবে স্মৃতিতে সব জমা করে রেখেছি। এক সময় আমার বয়স বেড়েছে। আমি একের সঙ্গে এক মিলিয়ে দুই করতে শিখেছি। তারপর হঠাৎ বুঝতে পেরেছি। বিয়ের আগে আগে তোমার একটা এবরশান হয়েছিল। কাঁটা সরিয়ে তুমি বিয়ে করেছ। বিয়ের পর দু'জনে দু'জনকে ভালবাসার প্রবল ভান করেছ। আমি অবাক হয়ে তোমাদের দু'জনের ভালবাসাবাসির ভান দেখতাম। মনে মনে হাসতাম। হাসির শব্দ যেন তোমরা শুনতে না পাও সে জন্যে উঁচু ভল্যুমে গান ছেড়ে দিতাম।

তোমার যেমন নিশিরাতে চাবি খুলে আমার ঘরে ঢুকে আমাকে দেখার অভ্যাস, আমার

তেমনি মাঝে মাঝে তোমাদের ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তোমাদের কথা শোনার অভ্যাস হয়ে গেল।

আমি যে অন্যায়টা করেছি খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও সেই অন্যায়ের পেছনে তোমার একটা ভূমিকা আছে, সত্যি আছে। তুমি তোমার প্রথম যৌবনে যে অন্যায়টা করেছিলে– আমি সব সময় ভেবেছি সেই অন্যায় আমিও করব। এরকম অদ্ভুত ইচ্ছার কারণ তোমার প্রতি ভালবাসাও হতে পারে, আবার তোমার প্রতি ঘৃণাও হতে পারে। ঠিক কোনটা আমি জানি না।

মা, তোমাকে সত্যি কথা বলি। ঐ ভদ্রলোকের জন্যে আমার ভেতর সাময়িক প্রবল মোহ অবশ্যই তৈরি হয়েছিল। তা না হলে এত বড় অন্যায় করা যায় না। তবে সত্যিকার ভালবাসা বলতে যা, তা বোধ হয় আমার তাঁর প্রতি হয়নি। কাজেই তাকে বিয়ে না করলেও কিছু যায় আসে না। বিয়ে না করাটাই বরং ভাল। আমার বর্তমান যে শারীরিক সমস্যা তা আমি তোমার মত করে মিটাতে পারি। ভাল একটা ক্লিনিকে ভর্তি হতে পারি। পনেরো কুড়ি মিনিটের ব্যাপার। কেউ কিছু বুঝতেও পারবে না। আমি কিন্তু তা করব না মা।'

রওশন আরা ভাঙা গলায় বললেন, 'তুই কি করবি?'

স্বাতী শান্ত গলায় বলল, 'যে শিশুটি পৃথিবীতে আসতে চাচ্ছে আমি তাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসব। তাকে বড় করব। তাকে শুদ্ধতম মানুষ হিসেবে বড় করব।'

'তার কোন বাবা থাকবে না?'

স্বাতী সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'আমার কথা শেষ হয়েছে। বাতি জ্বালাব?'

'না।'

'এখনো কি তোমার আমার বিছানায় বসে থাকতে ঘেন্না লাগছে?'

রওশন আরা জবাব দিলেন না। স্বাতী বলল, 'কফি খাবে মা? কফি বানিয়ে আনব?'

রওশন আরা সেই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। স্বাতী হাসছে। শুরুতে অস্পষ্ট ভাবে হাসলেও শেষে বেশ শব্দ করেই হাসতে শুরু করল। সেই হাসির শব্দ পুরোপুরি স্বাভাবিক মানুষের শব্দের মত না। কোথাও যেন এক ধরনের অস্বাভাবিকতা আছে। রওশন আরা চমকে চমকে উঠছেন। স্বাতী হঠাৎ হাসি থামিয়ে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'মা যাও, ঘুমুতে যাও।'

রওশন আরা উঠলেন। প্রায় নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হলেন। নিজের শোবার ঘরে ঢুকলেন। নাজমুল সাহেব বললেন, 'তুমি কি ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছ কে জানে? এক ফোঁটা ঘুম আসছে না। জেগেই আছি।' রওশন আরা জবাব দিলেন না, দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন। নাজমুল সাহেব বললেন, 'এতক্ষণ কি গল্প করছিলে? আশ্চর্য! এসো, ঘুমুতে এসো।'

রওশন আরা শোবার ঘরের দরজা লাগিয়ে বিছানায় এলেন, আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বাতী এসে দরজায় টোকা দিল। করুণ গলায় ডাকল, 'বাবা!'

নাজমুল সাহেব চমকে উঠে বসলেন। বিস্মিত গলায় বললেন, 'কি হয়েছে মা?'

স্বাতী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আমার কেন জানি ভয় ভয় লাগছে। বাবা, আমি কি শুধু আজ রাতের জন্যে তোমাদের দু'জনের মাঝখানে ঘুমুতে পারি? শুধু আজ রাতের জন্যে?'

জাহিন খুব অবাক হয়ে দেখছে। এত সুন্দর কোন মেয়ে সে বোধ হয় এর আগে দেখেনি। টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ, মাথা ভর্তি চুল ঢেউয়ের মত নেমে এসেছে। এমন চুল যে হাত দিয়ে ছুঁয়ে না দেখলে মন খারাপ লাগে। মেয়েটা মুখ টিপে কি সুন্দর ভঙ্গিতেই না হাসছে।

'তোমার নাম জাহিন, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার জ্বর হয়েছিল, সেরেছে?'

'হুঁ্যা।'

'আমি কে তা কি তুমি জান?'

জাহিন হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। সে জানে। অবশ্যই জানে। এই পরীর মত মেয়েটা তার মা।

'তুমি এত রোগা কেন?'

'জানি না।'

'তোমার মাথায় চুল এত কম কেন? দেখ তো আমার মাথায় কত চুল। হাতে ছুঁয়ে দেখ। আমি ভেবেছিলাম তোমারও মাথাভর্তি চুল থাকবে। তোমার বাবা কি বাসায় আছে?'

'আছে।'

'ছবি আঁকছে?'

'না। ছবি আঁকার ঘরে চুপচাপ বসে আছে।'

'চুপচাপ যে বসে আছে সেটা বুঝলে কি করে?'

'পর্দার ফাঁক দিয়ে আমি মাঝে মাঝে দেখি।'

'পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখার দরকার কি? স্টুডিওতে সরাসরি ঢুকে যাও না কেন? বাবা রাগ করে?'

'রাগ করে না। কঠিন চোখে তাকায়।'

'আমি তোমার দিকে কেমন চোখে তাকাচ্ছি বল তো?'

জাহিন হাসল। লজ্জার হাসি। হঠাৎ অসম্ভব লজ্জা লাগছে। আবার অসম্ভব ভাল লাগছে। সে হাত বাড়িয়ে মা'র চুল স্পর্শ করল।

'জাহিন, বল তো আমি কে?'

'মা।'

'কার মা?'

জাহিন আবার লজ্জা পেয়ে হাসল। কিন্তু কার মা তা বলল না।

'তুমি কি আমার নাম জান?'

'জানি।'

'বল, আমার নাম কি বল।'

'আপনার নাম রুবি।'

'আমার সম্পর্কে আর কি জান?'

'আপনি খুব সুন্দর নাচতে পারেন।'

'তুমি কি আমার কোলে আসবে?'

জাহিন না সূচক মাথা নাড়ল। যদিও তার খুব ইচ্ছা করছে কোলে উঠতে। রুবি বলল, 'আমার কোলে আসবে না কেন, আমি কি খারাপ মেয়ে?'

জাহিন ক্ষীণ স্বরে বলল, 'অল্প খারাপ।'

'কেন? তোমার বাবাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম সেই জন্যে?'

'হুঁ।'

'আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে?'

'কোথায়?'

'তুমি যেখানে যেতে চাও সেখানেই যাব। চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, বুড়িগঙ্গা নদী।'

'আপনি কি স্বাতী আন্টিদের বাসা চেনেন?'

'না, চিনি না। ঠিকানা বের করে সেখানে অবশ্য যেতে পারি। স্বাতী আন্টিটি কে?'

'বাবার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল। তারপর হয়নি।'

'হয়নি কেন?'

'আমি জানি না।'

'তবু তোমার অনুমানটা কি?'

'স্বাতী আন্টির বাবাকে পছন্দ হয়নি। বাবাকে কেউ পছন্দ করে না।'

'আর কে পছন্দ করে নি?'

'আপনি করেন নি।'

'ও হ্যাঁ, তাও তো ঠিক। তুমি তাকে খুব পছন্দ কর?'

'হুঁ।'

'কেন?'

'বাবাকে তো পছন্দ করতেই হয়। বাবা–মা'কে পছন্দ না করলে পাপ হয়।'

'শুধু পাপের ভয়ে বাবাকে পছন্দ কর?'

'বাবা ভাল।'

'বাবা তোমাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যায়? শিশু পার্কে নিয়ে যায়? ....'

'কোথাও নিয়ে যায় না তবু ভাল।'

'তুমি কি জান, আমি তোমাকে আমেরিকা নিয়ে যেতে এসেছি?'

'জানি। বাবা বলেছে।'

'তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

জাহিন হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। রুবি বলল, 'আমি জানি বাবাকে ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে। খুব কষ্ট হবে। কিন্তু এখানে থাকার চেয়ে আমার সঙ্গে যাওয়াই তোমার জন্যে ভাল। কেন সেটা জান?'

'জানি। বাবা বলেছে।'

'কি বলেছে?'

'এখানে আমার একা একা থাকতে হয়। বাবা সারাদিন ছবি আঁকে। আমার দেখার কেউ নেই।'

'আমার কাছে তুমি খুব ভাল থাকবে। তুমি আরো দু'জন ভাই–বোন পাবে। ওরা ভীষণ দুষ্টু আবার ভীষণ ভাল। তুমি হবে তাদের সবার বড় বোন। তাদের দেখে শুনে রাখবে। তোমাকে খুব বড় স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেব। খুব আনন্দ নিয়ে বড় হবে। তারপর যদি বাবার কাছে ফিরে আসতে ইচ্ছে হয়, ফিরে আসবে।'

জাহিন কিছু বলছে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এখন তার একটু কান্না কান্নাও লাগছে। রুবি বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে গেলে তোমার বাবার জন্যেও ভাল হবে। সারাক্ষণ তোমাকে নিয়ে তার যে দুশ্চিন্তা সেটা থাকবে না। সে নিজের মনে কাজ করতে পারবে। সে হয়ত ভাল একটা মেয়েকে বিয়ে করে আবার সংসার শুরু করবে। কে জানে, তোমার স্বাতী আন্টি হয়ত ফিরে আসবে। অনেক সময় আগের পক্ষের ছেলে মেয়ে সংসারে থাকলে মেয়েরা তাকে বিয়ে করতে চায় না।'

জাহিন খুব মন দিয়ে কথা শুনছে। কথাগুলি তার কাছে সত্যি বলে মনে হচ্ছে। রুবি বলল, 'চল এখন আমরা বেড়াতে বের হই। তোমার বাবাকে হ্যালো বলে যাই। তুমি কাপড় বদলে ভাল একটা জামা পর।'

'এটাই আমার সবচে ভাল জামা।'

'এটাও অবশ্যি মন্দ না। তবে আজ আমরা অনেকগুলি ভাল জামা কিনব। তোমার চুলগুলিও সুন্দর করে কেটে দিতে হবে। অনেক কাজ। আমরা আজ প্রথম কোথায় যাব?'

'স্বাতী আন্টিদের বাড়িতে।'

'ও হ্যাঁ। তোমার বাবার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে নিতে হবে।'

স্বাতীর সঙ্গে তাদের দেখা হল না।

নাজমুল সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, 'আমার মেয়েটার শরীর ভাল না। তোমরা আরেক দিন এসো।' জাহিন বলল, 'আমি শুধু দূর থেকে ওনাকে একটু দেখেই চলে যাব।'

নাজমুল সাহেব তারপরেও বললেন, 'আজ না। আজ না। আরেক দিন।'

জাহিন স্বাতীদের বাড়ি থেকে মন খারাপ করে বের হয়েছে। রুবি বলল, 'আমরা আবার আসব। দেশ ছেড়ে চলে যাবার আগে দেখা করে যাবই, তাই না জাহিন?'

'হ্যাঁ।'

'একটা কবিতা আছে না, একবার না পারিলে দেখ শত বার। আমরা শতবার দেখব। কি বল জাহিন?'

'হুঁ।'

'এখন কোথায় যাওয়া যায়। চিড়িয়াখানায়?'

'হুঁ।'

'চিড়িয়াখানার কোন প্রাণীটা তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে?'

'জানি না।'

'জান না কেন?'

জাহিন জবাব দিল না। রুবি বলল, 'অন্য কোথাও যেতে চাও?'

'হুঁ।'

'বল কোথায়। তুমি যেখানে যেতে চাও, আমি নিয়ে যাব।'

'লিলি আন্টিদের বাড়িতে যাব।'

'লিলি আন্টি কে?'

জাহিন উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'উনি একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তখন খুব ঝড় বৃষ্টি হল। আমরা ঝড় বৃষ্টিতে খুব হুটোপুটি করেছি। শিল কুড়িয়েছি। বাড়ির সামনে পানি ভর্তি একটা গর্ত আছে না? আমরা দু'জন ধপ করে গর্তে পড়ে গেলাম। আমরা দু'জন খুব বন্ধু।'

'উনি কি একদিনই এসেছিলেন?'

'হুঁ।'

'একদিনেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল?'

'হুঁ।'

'বন্ধুত্ব অবশ্যি হবার হলে একদিনেই হয়। হবার না হলে কখনোই হয় না। তোমার বাবার সঙ্গেও আমার একদিনেই বন্ধুত্ব হয়েছিল। খুব মজার ঘটনা। শুনবে?'

জাহিনের শুনতে ইচ্ছা করছে না। কারণ এই মহিলা তাকে লিলি আন্টিদের বাড়িতে নিয়ে যাবে কি না তা সে বুঝতে পারছে না। লিলি আন্টির ঠিকানা তার কাছে আছে। তিনি কাগজে লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু উনি তো ঠিকানাটা চাচ্ছেন না।

'হয়েছে কি শোন। ছবির একটা এক্সিবিশন হচ্ছে। আমি আমার বাবার সঙ্গে এক্সিবিশন দেখতে গেলাম। একটা ছবির সামনে থমকে দাঁড়িয়েছি। কি যে সুন্দর ছবি। টিনের ঘরের বারান্দায় একটি তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির পানি দিয়ে মেয়েটি মুখ ধুচ্ছে। ছবি–টবি তো আমি বুঝি না। জীবনে কোন ছবি দেখে এত অবাক হইনি। আমি ছবির আর্টিস্টের কাছে গিয়ে বললাম, ছবিটা আমার এত ভাল লাগছে কেন বুঝিয়ে দিন।

আর্টিস্ট হেসে ফেলল। তোর বাবা যে খুব সুন্দর করে হাসে সেটা নিশ্চয়ই তুই জানিস?'

'জানি।'

'সেই হাসিও দেখি ছবির মতই সুন্দর। এই যে তোর বাবাকে ভাল লাগল, লাগলই। গল্পটা সুন্দর না জাহিন?'

'হুঁ। আমরা লিলি আন্টিদের বাসায় কখন যাব?'

'এখনই যাওয়া যায়। কিন্তু আমার কাছে তো ঠিকানা নেই।'

'আমার কাছে ঠিকানা আছে।'

জাহিন কাগজের টুকরোটা বের করল।

কোন বাড়ির সদর দরজা এমন করে খোলা থাকতে পারে তা রুবির ধারণায় ছিল না। দরজা খোলা। তারা কলিং বেল বাজাচ্ছে। কেউ আসছে না। অথচ ভেতরে মানুষের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। জাহিন তার মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা কি ভেতরে ঢুকে যাব?'

রুবি বলল, 'সেটা কি ঠিক হবে? অপরিচিত একটা বাড়ি। কেউ এলে পরিচয় দিয়ে তারপর ভেতরে যাওয়া উচিত।'

'কেউ তো আসছে না।'

'তাই তো দেখছি। চল ঢুকে পড়ি।'

তারা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রুবি অবাক হয়ে দেখল অবিকল পরীর মত মেয়ে দোতলার বারান্দা থেকে তাদের দেখে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে আসছে। এসেই মেয়েটি জাহিনকে কোলে তুলে নিল। জাহিন মেয়েটির শাড়িতে মুখ চেপে রেখেছে। তার ছোট্ট শরীর কাঁপছে। সে কাঁদছে। রুবির বিস্ময়ের সীমা রইল না।

প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে যাবার পর লিলি লজ্জিত ভঙ্গিতে রুবির দিকে তাকাল। রুবি বলল, 'যে মেয়েটি আপনার কোলে বসে কাঁদছে আমি তার মা। হুট করে ঢুকে পড়েছি।'

'খুব ভাল করেছেন।'

লিলি কিশোরীদের মত গলায় চেঁচিয়ে বলল, "মা দেখ! দেখ কে এসেছে।' ফরিদা রান্নাঘর থেকে বের হয়ে বললেন, 'কে এসেছে?'

'জাহিন এসেছে। জাহিন।'

'জাহিনটা কে?'

লিলি জবাব দিতে পারছে না। সে লজ্জিত ও বিব্রত মুখে মা'র দিকে তাকিয়ে আছে। জাহিন মেয়েটা তাকে খুব লজ্জায়ও ফেলে দিয়েছে। কেঁদে কেঁদে তার শাড়ি প্রায় ভিজিয়ে ফেলেছে। এত কাঁদছে কেন মেয়েটা?

বাড়ির সবাই এসে ভিড় করছে। রুমু ঝুমু এসেছে, বড় চাচা সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, ছোট চাচাকেও দেখা যাচ্ছে। কাজের দুই বুয়াও রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এসেছে। রুবি বলল, 'আমার মেয়েটা কিছুক্ষণ থাকুক আপনার কাছে। আমি পরে এসে নিয়ে যাব।'

লিলি হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারল না। জাহিনের কান্নার কারণে তার নিজেরও এখন কান্না এসে গেছে। জাহিনের মা চলে যাচ্ছেন, সে তাঁকে এগিয়ে দিতে পর্যন্ত গেল না। জড়ভরতের মত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। ফরিদা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা কি, এই মেয়ে কে?'

'একজন আর্টিস্টের মেয়ে মা, হাসনাত সাহেবের মেয়ে।'

'তুই কাঁদছিস কেনরে লিলি। মেয়েটা কাঁদছে, তুইও কাঁদছিস। ব্যাপারটা কি?'

ফরিদার বিস্ময় কিছুতেই কমছে না।

……

সকাল বেলাতেই নেয়ামত সাহেবের ঘরে লিলির ডাক পড়েছে। লিলি ভয়ে ভয়ে উপস্থিত হল। নেয়ামত সাহেব অস্বাভাবিক কোমল গলায় বললেন, 'মা বস।'

লিলি বসল।

'মা, কাছে এসে বস।'

লিলি বাবার কাছে একটু সরে এল। খুব কাছে আসতে লজ্জা লাগছে। বাবা তুমি তুমি করে বলছেন। তাতেও লজ্জা লাগছে।

'তোমার বিয়ের কার্ড ছাপা হয়েছে দেখ। হাতে নিয়ে দেখ। লজ্জার কিছু নেই। হারামজাদারা একটা বানান ভুল করেছে। ভুল লিখেছে দন্ত্য স দিয়ে, ধরে চাবকানো দরকার। তবে ছেপেছে ভাল। কার্ড পছন্দ হয়েছে মা?'

'জি বাবা।'

'ভুল বানানটার জন্যে মনের ভিতর একটা খচখচানি রয়ে গেল। যাই হোক কি আর করা! তোমার কয়টা কার্ড দরকার বল তো মা।'

'আমার কার্ড লাগবে না বাবা।'

'কার্ড লাগবে না মানে! অবশ্যই লাগবে। বন্ধু–বান্ধবদের নিজের হাতে দাওয়াত দিয়ে আসবে। এইসব ব্যাপারে আমি খুব আধুনিক। ড্রাইভারকে বলে দিয়েছি সারাদিনের জন্যে গাড়ি তোমার। বিশটা কার্ডে হবে মা?'

'জি হবে।'

'ফ্যামিলি সুদ্ধ দাওয়াত দেবে। দাওয়াতে কার্পণ্য করবে না। নাও মা, কার্ডগুলি নাও– হারামজাদারা ভুল বানানে গণ্ডগোল করে মনটা খারাপ করে দিয়েছে। যাই হোক, কি আর করা। মা, দাওয়াত দেয়ার সময় মুখে বলবে, উপহার আনতে হবে না। দোয়াই কাম্য। কার্ডে লিখে দেয়া উচিত ছিল। অনেকেই আবার এইসব লিখলে মাইন্ড করে বলে লেখা হয় নাই।'

'বাবা, আমি যাই?'

'আচ্ছা মা, যাও। যে সব বাড়িতে যাবে সেখানে মুরুব্বী কেউ থাকলে পা ছুঁয়ে সালাম করবে। মুরুব্বীদের দোয়া যে কত কাজে লাগে তা তোমরা জান না। জগৎ সংসার টিকেই থাকে মুরুব্বীদের দোয়ায়।

মাতৃী গভীর আগ্রহে বিয়ের কার্ড দেখছে। লিলি তাকিয়ে আছে মাতৃীর দিকে। কি চেহারা

হয়েছে স্বাতীর। যেন সে কতদিন ধরে ঘুমুচ্ছে না, খাচ্ছে না।

'তুই এমন হয়ে গেছিস কেন স্বাতী?'

'কেমন হয়ে গেছি? পেত্নী?'

'প্রায় সেরকমই।'

'রাতে ঘুম হয় না, বুঝলি লিলি, এক ফোঁটা ঘুম হয় না। গাদা গাদা ঘুমের ওষুধ খাই। তারপরেও ঘুম হয় না। মা'র ধারণা আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

'তোর নিজের কি ধারণা?'

'আমার সে রকমই ধারণা। কাল রাত তিনটার সময় হঠাৎ হো হো করে এমন হাসি শুরু করলাম। আমি হাসি মা কাঁদে, আমি ততই হাসি।'

'তোর সমস্যা কি?'

'আমার অনেক সমস্যা। তোকে সব বলতে পারব না।'

'আমি তোকে একটি পরামর্শ দেব?'

'দে।'

'তুই হাসনাত সাহেবের কাছে ফিরে যা।'

স্বাতী রাগী গলায় বলল, 'কেন ফিরে যাব? ভালবাসার জন্যে ফিরে যাব? ওকে ভালবাসি তোকে কে বলল? ভালবাসা কখনো এক তরফা হয় না। ও কি ভালবাসে আমাকে? কখনো না। আমার একটা ছবি এঁকেছে। ছবিটা তুই ভাল করে লক্ষ করেছিস? ভাল করে দেখ। ছবির মেয়েটার চিবুকে লাল তিল আছে। আমার চিবুকে লাল তিল আছে? কোত্থেকে এই তিল এল? তার স্ত্রীর চিবুকে তিল ছিল। ওর কোন প্রেমিকা দরকার নেই। ওর দরকার জাহিনের দেখাশোনার জন্যে একজন মা। ওকে বিয়ে করলে আমাকে কি করতে হবে জানিস? ওর স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। আমি কোনদিনও তা করব না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। তুই শান্ত হ।'

স্বাতী চুপ করল। বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। লিলি বলল, 'আমি এখন যাই স্বাতী?'

'কোথায় যাবি? হাসনাতের ওখানে?'

লিলি কিছু বলল না, চুপ করে রইল। স্বাতী বলল, 'আমি তোর চোখ দেখেই বুঝেছি তুই তার কাছে যাবি। বিয়ের দাওয়াতের অজুহাতে যাবি। তাই না?'

লিলি চুপ করে রইল।

স্বাতী তীব্র গলায় বলল, 'তোর সাহসের এত অভাব কেনরে লিলি। একটু সাহসী হ। আমার সঙ্গে এতদিন থেকেও তোর সাহস হল না, এটাই আশ্চর্য। আমি কি প্রচণ্ড সাহসী একটা কাজ করতে যাচ্ছি তা কি জানিস?'

'না।'

'মা'কে জিজ্ঞেস করিস। মা বলবে। নাও বলতে পারে। মা তো তোর মতোই একটা মেয়ে। শাড়ি দিয়ে শরীর ঢাকতে ঢাকতে সব কিছু ঢাকার অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'স্বাতী, আমি যাই।'

'যা। ওকে জিজ্ঞেস করিস তো কোন সাহসে আমার চিবুকে সে লাল তিল আঁকল?'

লিলি সিঁড়ি দিয়ে নামছে। একতলায় স্বাতীর মা'র সঙ্গে তার দেখা হল। তিনি বিড় বিড় করে বললেন, 'মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দ্রুত খারাপ হচ্ছে। আমি কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। ও প্রায়ই আমাকে চিনতে পারে না।'

'এইসব কি বলছেন খালা?'

'সত্যি কথা বলছি মা। সত্যি কথা বলছি। ও আমাকে শাস্তি দিতে গিয়ে নিজে শাস্তি পাচ্ছে।'

তিনি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

হাসনাত বাসায় ছিল। লিলিকে দেখে সে খুব অবাক হল। লিলি বলল, 'জাহিন কোথায়?'

'ও তার মা'র হোটেলে। ওর মা এসেছে ওকে নিয়ে গেছে।'

'আমি জানি। জাহিন আমাকে সব বলেছে।'

'বিয়ের কার্ড?'

'হ্যাঁ। বুঝলেন কি করে বিয়ের কার্ড?'

'অনুমান করেছি।'

'আপনি বিয়েতে এলে আমি খুব খুশি হব।'

'আমি যাব, আমি অবশ্যই যাব।'

'আরেকটা কাজ যদি করেন তাহলেও আমি খুব খুশি হব।'

'বল, আমি অবশ্যই করব।'

'স্বাতীর সঙ্গে যদি একটু দেখা করেন। ও ভয়াবহ সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।'

'লিলি, আমি সেটা জানি। আমি গিয়েছিলাম ওর কাছে। স্বাতী আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়নি। এসো, ভেতরে এসে বোস।'

'জ্বি না, আমি বসব না।'

হাসনাত ক্লান্ত গলায় বলল, 'স্বাতীর ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। রুবির ব্যাপারটাও বুঝি নি। কাউকে ধরে রাখার ক্ষমতা আমার নেই। এইটুকু শুধু জানি। বাস্তবে কাউকে ধরে রাখতে পারি না বলেই বোধ হয় ছবিতে ধরে রাখতে পারি।'

লিলি বলল, 'আমি যাই?'

হাসনাত বলল, 'তুমি কি ঘন্টা খানিক বসতে পারবে? ঘন্টা খানিক বসলে অতি দ্রুত একটা ছবি এঁকে ফেলতাম। মাঝে মাঝে আমি খুব দ্রুত কাজ করতে পারি।'

'জ্বি না। আমি এখন যাব।'

হাসনাত গেট পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিতে এল। হঠাৎ তাকে অবাক করে দিয়ে লিলি নিচু হয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করল।

হাসনাত বলল, 'আমি প্রার্থনা করছি তোমার জীবন মঙ্গলময় হবে।'

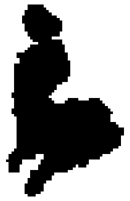

……

বিংশ শতাব্দীর অষ্টম আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে গেছে।

জাহেদুর রহমান আমেরিকার ভিসা পেয়েছে। সে অসম্ভব অবাক হয়ে লক্ষ্য করল তার কোন রকম আনন্দ হচ্ছে না। বরং হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে আর কিছুই করার নেই। সে গুলশান থেকে বাসায় ফিরল হেঁটে হেঁটে এবং প্রথম বারের মত এই নোংরা দেশের সব কিছুই তার অসম্ভব ভাল লাগতে লাগল। ঘন্টা বাজাতে বাজাতে রিক্সা যাচ্ছে— কি সুন্দর লাগছে দেখতে। রাস্তার দু'পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল ফুটেছে— আহা কি দৃশ্য! আকাশ জোড়া ঘন কালো মেঘ। বর্ষা আসি আসি করছে। আসল কালো মেঘগুলি বের হবে বর্ষায়। দিন রাত বর্ষণ হবে। রাস্তায় পানি জমে যাবে। সেই পানি ভেঙে বাসায় ফেরা। এই আনন্দের তুলনা কোথায়?

পৃথিবীর সবচে বড় আনন্দ হল— সমস্যার আনন্দ। চারদিকে সমস্যা কি কম? লিলির বিয়ে হচ্ছে। কত রকম ঝামেলা। রুমু ঝুমু বড় হচ্ছে, এদের বিয়ে দিতে হবে। সমস্যার কি কোন শেষ আছে? বাড়িটা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। সেই ঝামেলাও মেটাতে হবে। সব ছেড়ে বিদেশে গিয়ে পড়ে থাকলে হবে? কি আছে সাদা চামড়ার দেশে? সমস্যাহীন ঐ দেশে থেকে হবেটা কি?

বাড়ি ফেরার পথে জাহেদুর রহমান বৃষ্টির মধ্যে পড়ে গেল। যাকে বলে ঝুম বৃষ্টি। এত ভাল লাগছে বৃষ্টিতে ভিজে হাঁটতে। পাসপোর্টটা ভিজে জবজবে হয়ে যাচ্ছে। ভিজুক। হু কেয়ারস? শালার পাসপোর্ট।

কাক ভেজা হয়ে জাহেদুর রহমান বাড়িতে ঢুকল। প্রথমেই দেখা হল লিলির সঙ্গে। লিলি শংকিত গলায় বলল, 'ভিসা এবারও হয়নি, তাই না?'

জাহেদুর রহমান দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল না।

লিলি বিষণ্ণ গলায় বলল, 'তুমি মন খারাপ করো না ছোট চাচা। তোমার মনটা এত খারাপ দেখে আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছে।' আহারে, মেয়েটা তো সত্যি কাঁদছে!

জাহেদুর রহমানের চোখ ভিজে উঠছে— বিদেশ বিভুঁইয়ে কে তার জন্যে চোখের জল ফেলবে। কেউ না।

'ছোট চাচা!'

'কি রে!'

'মন খারাপ করো না ছোট চাচা, প্লীজ।'

'আচ্ছা যা মন খারাপ করব না।'

'পরের বার নিশ্চয়ই হবে।'

'আর এপ্লাই করব না। যথেষ্ট হয়েছে, এখন কষ্ট-টষ্ট করে দেশেই থাকব।'

জাহেদুর রহমান তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে চিলেকোঠার দিকে যাচ্ছে। এত ভাল লাগছে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে।

বিয়ে উপলক্ষে অনেকদিন পর লিলিদের বাড়ি চুনকাম হচ্ছে। পুরনো বাড়ি সাজতে শুরু করেছে নতুন সাজে। বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলিও কি বদলাচ্ছে? নেয়ামত সাহেব মেয়ের সঙ্গে যে স্বাভাবিক নরম গলায় কথা বলেন সেই কথায় লিলির চোখে প্রায়ই পানি এসে যায়। সেদিন হঠাৎ বললেন, মা লো কাছে বস তো একটু।

লিলি কাছে বসল। নেয়ামত সাহেব মেয়ের মাথায় হাত রেখে কিছুক্ষণ পর কাঁদতে শুরু করলেন। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, তোর ঐ বান্ধবী কি যেন নাম, সাথী। ও আসে না কেন? বিয়ের সময় বন্ধু বান্ধব আশেপাশে থাকলে মনটা ভাল থাকে। ওকে খবর দিয়ে নিয়ে আয়, থাকুক কয়েক দিন তোর সাথে।

লিলি বলে না যে সাথী অসুস্থ। সাথী এখন তাকে পর্যন্ত চেনে না। লিলি তাকে গত কালও দেখতে গিয়েছিল। সাথী তাকে দেখে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলেছে, বসুন। মা ওনাকে বসতে দাও। রওশন আরা লিলির দিকে তাকিয়ে তীব্র গলায় বললেন, কেন আমার মেয়েটা এ রকম হল? কেন হল? লিলি এখন নিজের মত তার বিয়ের প্রস্তুতি দেখে। তার ভালও লাগে না, মন্দও লাগে না।

রাতে মা তার সঙ্গে ঘুমুতে আসেন। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকেন। লিলির তখনই শুধু খুব একা লাগে। তখন খুব অন্যায় একটা ইচ্ছার জন্ম মনে আসে। মনে হয়, ইশ কেউ একজন যদি সাথীর মত একটা ছবি তার এঁকে দিত। কেউ একজন যদি তাকে দেখাতো কি করে আকাশের তারা নামিয়ে আনা যায়। সে খুব সন্তর্পণে কাঁদে। এমনভাবে কাঁদে যেন তার শরীর না কাঁপে। যেন তার মা কিছু বুঝতে না পারেন। কিন্তু তিনি বুঝে ফেলেন। মেয়েকে এমন ভাবে বুকে জড়িয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলেন, 'মারে, তোর যদি সত্যি সত্যি মনের মানুষ কেউ থাকে তুই পালিয়ে চলে যা তার কাছে। কি আর হবে? তোর বাবা আমাকে ধরে মারবে। এটা তো নতুন কিছু না।'

লিলি অস্পষ্ট স্বরে বলে, 'মনের মানুষ কেউ নেই মা।'

লিলির মা লিলির চেয়েও নিচু গলায় বলেন, 'সত্যি নেই? একদিন যে কোথায় গেলি। অনেক রাত করে ফিরলি......'

লিলি হাসে। বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসে। অনেকটা সাথীর মত করে হাসে। লিলির মা মেয়ের সেই হাসির মানে ধরতে পারেন না। তাঁর বড় কষ্ট হয়। লিলি মা'কে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তুমি এত ভাল কেন মা? তুমি, বাবা, ছোট চাচা, বড় চাচা, রুমু ঝুমু— তোমরা যদি আরেকটু কম ভাল হতে তাহলে আমার এত কষ্ট হত না।'

লিলি কাঁদে।

মা তাঁর গায়ে মাথায় ক্রমাগতই হাত বুলিয়ে দেন।

……

রুবিদের ফ্লাইট রাত আটটায়। জাহিনের জিনিসপত্র গোছানো হয়েছে একদিন আগেই। যাবার দিনে তার কিছু গোছানোর নেই। সে ঠিক করে রেখেছিল যাবার দিনটা সারাক্ষণ সে বাবার সঙ্গে গল্প করবে। কিন্তু হাসনাত সকাল থেকেই স্টুডিওতে। দরজা বন্ধ করে কাজ করছে। গতরাতের পুরোটাই কেটেছে স্টুডিওতে। গভীর রাতে জাহিনের ঘুম ভেঙেছে। সে দেখে বিছানা খালি স্টুডিওতে আলো জ্বলছে। একবার সে ভাবল বাবাকে ডাকে। শেষ পর্যন্ত ডাকল না। স্টুডিওর দরজার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার পাশে কোল বালিশ। বালিশটাকে বাবা ভেবে সে জড়িয়ে ধরে থাকল।

স্টুডিও থেকে হাসনাত বের হল দুপুরে। সে ভেবে রেখেছিল ভাল কোন রেস্টুরেন্টে মেয়েকে নিয়ে যাবে। তার হাতে তেমন সময় নেই। তার খুব ইচ্ছে প্লেনে ওঠার সময় মেয়ের হাতে একটা ছবি তুলে দেবে। বেশ কিছু কাজ এখন বাকি রয়ে গেছে। রেস্টুরেন্টে গিয়ে নষ্ট করার সময় নেই। হাসনাত বলল, 'টোস্ট আর ডিমভাজা খেয়ে ফেললে কেমন হয় মা?'

জাহিন বলল, 'খুব ভাল হয়।'

হাসনাত ডিম ভাজল। রুটি টোস্ট করার সময় নেই। এমনি খেয়ে নিলেই হয়।

'জাহিন!'

'জি বাবা।'

'আজ একটু খারাপ খেলে কিছু হবে না। প্লেনে কত ভাল ভাল খাবার দেবে। তাই না?'

'হুঁ।'

'আমি ছবিটা শেষ করতে থাকি, তুই কাপড় টাপড় পরে তৈরি হতে থাক।'

'আচ্ছা।'

জাহিন একা একা বারান্দায় হাঁটল। বাগানে কিছুক্ষণ ঘুরল। এবং মাঝে মাঝেই স্টুডিওর দরজার পাশে এসে দাঁড়াতে লাগল। একবার মনে মনে ডাকল, বাবা। মনের ডাক কেউ শুনতে পায় না। হাসনাত শুনল না। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় ছবিতে।

সন্ধ্যায় রুবি যখন গাড়ি নিয়ে এসে হর্ন বাজাচ্ছে তখন হাসনাতের ছবি শেষ হল। সে কাগজে মুড়ে ছবিটা মেয়ের হাতে দিয়ে হাসল।

হাসি দেখেই জাহিন বুঝেছে, বাবা খুব সুন্দর ছবি এঁকেছে। তবে ছবিটা সে এখন দেখবে না। প্লেনে উঠে দেখবে।

হাসনাত বলল, 'মা, তুমি তোমার পড়ার ঘরে ছবিটা টানিয়ে রেখ।'

জাহিন বলল, আচ্ছা।

হাসনাত বলল, 'তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই, তোমরা রওনা হয়ে যাও।'

রুবি বিস্মিত হয়ে বলল, 'রওনা হয়ে যাও মানে? তুমি সি অফ করতে যাবে না?'

'ইচ্ছে করছে না। খুব ক্লান্ত লাগছে।'

'ক্লান্ত লাগলেও চল।'

হাসনাত বিষণ্ণ গলায় বলল, 'বিদায়ের দৃশ্য আমার ভাল লাগে না।'

'কারোরই ভাল লাগে না। তারপরেও তো লোকজন বিদায় দিতে যায়। যায় না?'

এয়ার পোর্টে গাদাগাদি ভিড়। কি ভয়ানক ব্যস্ততা চারদিকে। কেউ যেন কাউকে চেনে না।

জাহিনের কাঁধে একটা হ্যান্ডব্যাগ, এক হাতে সে মা'কে ধরে রেখেছে। অন্য হাতে কাগজে মোড়া ছবি। ছবিটি সে বুকের কাছে শক্ত করে ধরে আছে। হাসনাত এক কোণায় দাঁড়িয়ে। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়ের দিকে। জাহিন মা'র হাত ধরে গট গট করে এগুচ্ছে। নতুন কেনা গোলাপী ফ্রকে তাকে লাগছে পরীদের কোন শিশুর মত। সে একবারও পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে না।

রুবি বলল, 'মা তুমি বাবার কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই চলে এসেছ। আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি, তুমি যাও বাবাকে চুমু দিয়ে আস।'

জাহিন শান্ত গলায় বলল, 'না।'

'না কেন মা?'

'বাবাকে চুমু খেলে বাবা কাঁদতে শুরু করবে। বাবাকে কাঁদাতে ইচ্ছা করছে না।'

'কিন্তু তোমার বাবা হয়ত তোমাকে চুমু দেয়ার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। তুমি না গেলে কষ্ট পাবেন।'

'বাবা জানে আমি কেন যাচ্ছি না। বাবার অনেক বুদ্ধি।'

'বেশ চল, আমরা তাহলে যাই। বাবাকে কি একবার হাত নেড়ে বাই বাই বলবে?'

'না।'

'ছবিটা তুমি আমার কাছে দাও। এত বড় একটা ছবি তোমার নিতে কষ্ট হচ্ছে।'

'আমার কষ্ট হচ্ছে না।'

প্লেন আকাশে ওঠার পর জাহিন বলল, 'আমি ছবিটা একটু দেখব মা।'

রুবি মোড়ক খুলে ছবিটা মেয়ের হাতে দিলেন। জাহিন শান্ত গলায় বলল, 'একবার বাবা আমাকে স্কুল থেকে আনতে ভুলে গিয়েছিল। বারোটার সময় ছুটি হয়েছে। বাবা আনতে গেছে তিনটার সময়। বাবাকে দেখে আমি ছুটতে ছুটতে গিয়েছিলাম। সেই ছবিটা বাবা এঁকেছে। মা দেখ।'

ছবিতে ছোট্ট একটা মেয়ে দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে। হাওয়ায় তার চুল উড়ছে, স্কুল ব্যাগ উড়ছে। মেয়েটার চোখ ভর্তি জল।

রুবি অবাক হয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে। তার কাছে হঠাৎ মনে হল অপূর্ব এই

CREATED BY DEWAN IFTEKHAR HOSSAIN EMAIL: dewaniftekhar@gmail.com

ছবিটা রঙে আঁকা হয়নি। আঁকা হয়েছে চোখের জলে।

জাহিন চোখ মুছছে। রুবি দু'হাতে মেয়েকে কাছে টানলেন। জাহিন ফিস ফিস করে বলল, 'এয়ারপোর্টে বাবা কি রকম একা একা দাঁড়িয়েছিল।'

রুবি বললেন, 'সব মানুষই একা রে মা। সংসার, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে বাস করে। তারপরেও তারা একা।'

জাহিন প্লেনের জানালা দিয়ে তাকাল। তার খুব ইচ্ছা করছে অনেক অনেক দূর থেকে বাবাকে একটু দেখবে। কিন্তু প্লেন আকাশে উঠে গেছে। সাদা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে নীচের পৃথিবী।

জাহিন কাঁদছে। কাঁদছে প্রেমে বন্দি ফুলের পোশাক পরা বাচ্চা মেয়েটি।